চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের চারের দশকের উপন্যাসের মার্কসবাদ ভাবনা

বিগত শতাব্দীর চারের দশক নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বজোড়া আতঙ্ক, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে রাশিয়া আক্রমণ করলেন। ১৯৪১-এই গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। কমিউনিস্ট পার্টি তার 'জনযুদ্ধ নীতি' ঘোষণা করে, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এই 'জনযুদ্ধ নীতি'কে বেশ কিছু লেখক, বুদ্ধিজীবী অংশ মেনে নিতে পারেননি—যেমন, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের কথাসাহিত্যে এর সমালোচনা, তীব্র আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি তার 'জনযুদ্ধ' পর্বে যে মর্যাদা হারিয়েছিল, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনে পীড়িত মানুষের পাশে থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে থাকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রশংসা করেছেন এবং তিনি কমিউনিস্টদের কাছাকাছি এসেছিলেন, যার পরিণতি স্বরূপ 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি লেখেন। নৌ-বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, দাঙ্গা প্রভৃতি এই সময়পর্বেই ঘটে। ক্যাপ্টেন রসিদ আলির বিচারের নামে প্রহসনে দেশজুড়ে ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এ মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজন ছাত্রের। পার্টিকর্মী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ঘটনা যথেষ্ট নাড়া দেয় আর তারই প্রেক্ষিতে লেখেন 'চিহ্ন'। দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখেন 'স্বাধীনতার স্বাদ'। এই পর্বে সাবিত্রী রায় তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসীয় রাজনীতির তৎকালীন সময়পর্বকে 'সৃজন' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, সেখানে সদর্থক অনেক দিকের সঙ্গে সমালোচনাও দানা বেঁধেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পরিশীলিত দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসীয় চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মন্দ্র-মুখর', 'সূর্যসারথী' উপন্যাসে দেখা গেছে সশস্ত্র বিপ্লবের ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে চারের দশক বামপন্থী আন্দোলনের উত্তাল সময়। এই সময়ে মার্কসীয় মতাদর্শ

তার অনুশীলন প্রভৃতি বিষয় প্রতিষ্ঠা পায়। সেই সঙ্গে ওই মতাদর্শের সমালোচনাও ফুটে উঠেছে বিভিন্ন উপন্যাসে। দুটি দিকই উঠে এসেছে এই পর্বের আলোচনায়। উপরিউক্ত লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবন ও অন্যান্য রচনার আলোলচনার সূত্রে ওই বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হবে।

তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৭১)

■ **মন্বন্তর** (১৯৪৪)

বীরভূম জেলার লাভপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেই গ্রামেরই এক ছোটো জমিদার বংশে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মা প্রভাবতী দেবী। বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্যরসিক মানুষ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎচর্চা ছাড়াও 'বঙ্গবাণী', 'হিতবাদী', 'হিন্দু' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। মায়ের ছোটোবেলা কেটেছে পাটনা শহরে। মা-র নাগরিক বাতাবরণ ও পিতার গ্রামীণ প্রতিবেশে বড় হওয়া, ও জীবন যাপন তারাশঙ্করের মনন গঠনে পরিবর্তন এনেছিল। তারাশঙ্করের বিভিন্ন রচনায় মা-র প্রভাব লক্ষ করা যায়।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। তারাশঙ্করের বয়স তখন মাত্র আট। মা ও পিসিমার তত্ত্বাবধানে তারাশঙ্কর মানুষ হতে থাকেন। প্রাথমিক পড়াশোনার সূত্রপাত বৈদ্যনাথধামে (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দেওঘর)। ছাত্র হিসেবে সুনাম ছিল। পিতা চাইতেন তাঁর সন্তান যেন উকিল হয়। তারাশঙ্করের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি একটি তথ্য—''সামান্য কিছু আয়ের জমিদারের ঘরে জন্ম আমার। জমিদারি আয় থেকে আমার বাবার জমিদার জীবনটা বড় ছিল। কোঁচানো কাপড় পরতেন, গানবাজনার শখ ছিল, জীবনে প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনে আক্ষেপ ছিল—তাঁর বাবা উকিল ছিলেন, তিনি উকিল হননি বা হতে পারেননি। তাঁর সেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তিনি আমার জীবনে সঞ্চারিত করেছিলেন।''[১] গ্রামের স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। রাজনৈতিক সংযোগের কারণে ব্রিটিশের নজরদারির ফলে পড়া ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন। পরে আবার কলকাতার সাউথ সুবারবার্ন কলেজ (বর্তমানে যা আশুতোষ কলেজ)-এ ভর্তি হন কিন্তু এবারও পড়া শেষ হল না। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আবার তাঁকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়।

লাভপুর গ্রামেরই সম্ভ্রান্ত পরিবার যাদবলাল চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী উমাশশী দেবীর সঙ্গে তারাশঙ্করের বিবাহ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। গ্রামের সেবা সংঘের সম্পাদক হয়ে গ্রামসেবার কাজে মনোযোগ দেন। ''দুর্ভিক্ষ, কলেরা, অগ্নি নির্বাপণ প্রভৃতি সেবামূলক কাজে যুক্ত হন। এ-সময় অনুশীলন দলের বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।''[২] এই সেবামূলক কার্য পরিচালনা ছিল তারাশঙ্করের প্রিয় বিষয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর গান্ধীজির অহিংস পথের অনুবর্তী। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ''বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মাদকদ্রব্য পরিহার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ৫ অথবা ৬ আগস্ট ১৪৪ ধারা অমান্য করে লাভপুরে গ্রেপ্তার হন, তিন চার মাস জেল, ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পান।''[৩] এরপর রাজনীতি না সাহিত্যসেবা—কোনটিকে তিনি বেছে নেবেন, এই দ্বিধায় যখন তিনি দ্বিধান্বিত তখন দ্বিধা সরিয়ে ''কারাগারে বসেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। রাজনীতি নয়, সাহিত্যসেবার মাধ্যমেই তিনি দেশসেবা করবেন।''[৪]

এই কারাজীবনের পর্বেই 'চৈতালি ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুটির সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'চৈতালি ঘূর্ণি' ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'পাষাণপুরী' প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়ে গেছে 'রসকলি', 'হারানো সুর'। পরবর্তীকালে ১৯৩৪-এ 'রাইকমল' ও ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়াজাগানো গল্পগ্রন্থ 'জলসাঘর'। ওই বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'আগুন'। এরপর এক এক করে ১৯৩৯-এ 'ধাত্রীদেবতা', ১৯৪০-এ 'কালিন্দী' প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ই তারাশঙ্কর 'গণদেবতা' লিখতে শুরু করেন। ১৯৪২-এ গণদেবতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩-এ 'পঞ্চগ্রাম' ও 'কবি' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর ১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি।

বিগত বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশেকের উত্তাল সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই তরঙ্গ-অভিঘাতের বাইরে রাখেনি। জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ঘটনাবলী তাঁর সংবেদনশীল মননে আঘাত হানে। যুদ্ধ, মন্বন্তর-এর বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রগতি ভাবনার লেখকরা সংগঠিত হয়েছিলেন একটি ছাতার নিচে। সেই রকমই একটি সংগঠন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ স্থাপিত হয়। সেই সংঘের নেতৃত্বের জায়গায় ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ''১৯-২০ ডিসেম্বর, ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলেই।... সাহিত্যিক কবি শিল্পী ও বিপুল জনসমাবেশের মধ্যেই এই প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতির পদ অলংকৃত করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।''[৫]

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ থেকে ৮ মার্চ-এর সম্মেলন থেকে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' পুনরায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' হয়, তারাশঙ্কর সেই সম্মেলন পরিচালনার সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতমদের একজন ছিলেন। সেখানকার তাঁর বক্তব্যের দু-চার লাইন উল্লেখ করা প্রয়োজন—''...আপনাদের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেব। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে—এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম।''[৬]

জাতীয়তাবাদী চেতনা, আন্তর্জাতিকতায় সহানুভূতি, সেবাধর্ম প্রভৃতি তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির বিষয়ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুনকালের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্ব, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতি দরদ নতুন কালের সম্ভাবনায় আস্থাশীলতাও রাজনৈতিক উপন্যাসে এসেছে। রাজনীতিতে অনীহা থাকলেও উপন্যাসে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন, 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের গফুর 'মহেশ'কে মেরে ফেলার পর রাতের অন্ধকারে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে যায়। গফুর জানে কলের কাজে মেয়েদের আব্রুতা থাকে না। তবুও যায়। বিষয় ও আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকলেও আমরা তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১)-তে খানিকটা এরকম ঘটনার অনুবর্তন দেখি। গোষ্ট জমিদারের অত্যাচারে ও আর্থিক নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে জমিদারের চাপরাশিকে হত্যা করে সস্ত্রীক গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। নতুন জীবনে অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিকতার বাইরে শহুরে কারখানার জীবনে প্রবেশ করে গোষ্ট। কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ তথা সামন্ততন্ত্রের পীড়ন গোষ্ট মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, তাই নগরকেন্দ্রিক আবহাওয়ায় সে যারপরনাই খুশি। কিন্তু এই খুশিও তার বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে গোষ্ট প্রাণ হারায়। কৃষক জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে কারখানায় কাজ নিয়ে। এখানেই শেষ নয়, গোষ্টর বিধবা স্ত্রীর নৈতিক জীবনে যে দ্বন্দ্বময় ছবি ফুটে ওঠে তাও বেশ মর্মান্তিক। অর্থনৈতিক সংকট-এর হাত ধরে এসেছে নৈতিক সংকট। উভয় সংকটের ছবি তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায়। এই 'চৈতালীঘূর্ণি' উপন্যাসেই তারাশঙ্করের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ করলাম। অনাহারে গোষ্টর শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটে। অত্যাচারে জর্জরিত গোষ্ট ভগবানকে অস্বীকার করে এবং জমিদারতন্ত্রের অবসান চায়। সামন্ততন্ত্র-এর অত্যাচার পুঁজিতন্ত্রের পেষণকে সে দেখেছে, তারপর পুঁজিতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। অর্থাৎ লেখক ধর্মঘট লড়াই আন্দোলনকে জর্জরিত মানুষের মুক্তির হাতিয়ার মনে করেছেন। ''চৈতালী ঘূর্ণি'-র রাজনীতি-শ্রেণিসংগ্রাম ও

সমাজতন্ত্রবাদের রাজনীতি।”[৭]

‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাবার অকালমৃত্যুর পর তারাশঙ্কর মা ও পিসিমার কাছেই বড় হয়েছেন। ‘ধাত্রীদেবতা’র শিবনাথও তাই। তার কলকাতায় পড়তে যাওয়া, বিপ্লবী সংস্পর্শ, তাদের বিভীষিকাপন্থা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতিতে শিবনাথের মোহভঙ্গ হয়। শিবনাথ, মা জ্যোতির্ময়ীর কাছ থেকে পেয়েছে দেশপ্রেমের শিক্ষা, স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য। আর ও মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ শিবনাথ মানুষের প্রকৃত মুক্তির ক্ষেত্র হিসাবে আবিষ্কার করেছেন নিজের গ্রামকে অর্থাৎ ধরিত্রী বা বসুই যে প্রকৃত মুক্তির পথ এই বিশ্বাসই তারাশঙ্কর এঁকে দিয়েছেন তাঁর নায়ক শিবনাথের মধ্যে। ‘‘তাঁর দৃষ্টিতে বাস্তু দেশ ও ধরিত্রী, প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক যুগসংকট—সব মিলে এক অখণ্ড মানবমুখী চেতনা উদ্ভাসিত হয়েছে।”[৮]

‘গণদেবতা’ (১৯৪২) উপন্যাসের শেষ অংশ হল ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪)। এই দুটি উপন্যাসকে আমরা একসঙ্গে আলোচনার সূত্রে নিয়ে আসব। ‘গণদেবতা’ উপন্যাসে আমরা জমিদারতন্ত্রের ভাঙন, ব্যবসায়ী নব্য জমিদার গোষ্ঠীর উত্থানকে প্রত্যক্ষ করি। শিবনাথের মতোই দেবনাথও তারাশঙ্করের চেতনার বাহক। তারাশঙ্করের গ্রামসেবা, তাঁর রাজনৈতিক সংস্রব, কারাবরণ, কারাবরণকালে তাঁর রাজনীতি বিষয়ে নেতিবাচক উপলব্ধি ইত্যাদি অনেক কিছুরই ছাপ পড়েছে দেবনাথ চরিত্রে। জমিদার, মহাজন, রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সংঘাতে দেবনাথ জড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের মানুষের স্বার্থে। তাছাড়া প্রথমদিকে রাজনীতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনকালে সরকারি নিয়ম ভেঙে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিলে দেবনাথ জেলে যায়। সেখানেই দেবু উপলব্ধি করে রাজনীতি নয়, গ্রামীণ মানুষের সেবাকার্যের দ্বারাই মানুষের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তারাশঙ্কর এই সময় কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছেন। আগেই আলোচনা হয়েছে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনের কথা। ১৯৪২-এর ১৯-২০ ডিসেম্বর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর। এই কমিউনিস্ট সংস্রবে তাঁর সেবার তত্ত্বে কিছু দ্বিধার সঞ্চার ঘটায়। ‘পঞ্চগ্রাম’-এ এই উপলক্ষেই আমরা কমিউনিস্ট কর্মী বিশ্বনাথকে বেশি করে স্মরণ করব। সমাজ বিবর্তনের একটি অন্যতম ধাপ সামন্ততন্ত্রের ভাঙন, ছিরু পালের শ্রীহরি পালে রূপান্তরে বিশ্বনাথদের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়নি। বিশ্বনাথদের দেখানো হয়েছে সনাতন ঐতিহ্যের বিরোধী হিসাবে। ‘‘কিন্তু

বিশ্বনাথের মুখে যে কথাগুলি তিনি বসিয়েছিলেন, বা তথাকথিত গ্রামীণ সংস্কার বা সমাজসেবার অসারতাকে সে যে ভাষায় উপহাস করেছিল তা তারাশঙ্করের অবচেতন মনেরই প্রকাশ বলে মনে হয়।"[৯] বিশ্বনাথকে স্বতন্ত্র ধারার রাজনীতিক হিসেবে তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন। সেবাপরায়ণতার সঙ্গে নতুনকালের পদধ্বনির ডাক শোনা গেছে বিশ্বনাথে। 'কালিন্দী' (১৯৪০)-র অহীন্দ্রও মার্কসবাদ বিষয়ে আগ্রহী। অহীন্দ্র-র সঙ্গে লেখক প্রত্যক্ষ কমিউনিস্ট যোগ না দেখালেও রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবকদের বিপ্লবাত্মক কর্মের সঙ্গে তারাশঙ্কর তাকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আগের বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনার সূত্রে বলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্বে তারাশঙ্কর কমিউনিজম সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত হতে থাকেন। কিন্তু কমিউনিজম বিষয়ে তারাশঙ্করের আগ্রহ জন্মে অনেক আগে। ''১৯১৮ সালে রুশ দেশে গণবিপ্লব হয়ে গেল, ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর প্রথম গণআন্দোলন হয়ে গেল—সে আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তারই মধ্যে স্বপ্ন জাগল গণবিপ্লবের। তখন আমি রাজনৈতিক কর্মী। রহস্যাবৃত রাশিয়ার কথা—অপরূপ কথা শুনি—তার সঙ্গে কল্পনা করি। বই পাইনে। দু-একখানা বই রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে পাই—তা সংক্ষিপ্ত। মার্ক্সের ক্যাপিটাল পেয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য—কিছুটা পড়ার পর বইখানি ফেরত দিতে হয়েছিল এবং কিছুটা পড়েছিলাম তাও ইংরাজিতে স্বল্পজ্ঞানের জন্য বুঝতে পারিনি।"[১০] পরবর্তীকালে বিগত শতাব্দীর চারের দশকে তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''মতের পার্থক্য সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সে বন্ধন ছিল অনেকখানি অটুট। কমিউনিস্ট বন্ধুদের তিনি 'কমরেড' বলেও কখনও কখনও সম্বোধন করতেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে তাঁর 'তারিনী মাঝি' গল্পটি অনুবাদ করেন একটি সংকলনের জন্য। ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে যাতায়াত ছিল তাঁর।... কমিউনিস্ট মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসা সেই সঙ্গে তার নিজস্ব গান্ধীবাদী প্রত্যয় আর সমকালীন রাজনীতির অভিজ্ঞতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছিল তাঁর 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাস।"[১১]

'মন্বন্তর' ১৯৪৩-এর 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে।

জগদীশ ভট্টাচার্য ভূমিকা অংশে লিখেছেন, ''দেশের বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে বাঙালীর 'এ যুগের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে মেয়েদের জীবন নিয়ে' যে বই লিখবার কল্পনা সেদিন তাঁর ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে 'মন্বন্তর'-এ"[১২] জগদীশ ভট্টাচার্য ভূমিকা

অংশে আরও বলেছেন—''এ যুগের আদর্শ বলতে তিনি সাম্যবাদী আদর্শের কথাই বুঝেছেন।''[১৩] এই 'মন্বন্তর' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট নগর কলকাতা।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা দুটি চিত্র পেতে পারি—(১) দেশের বর্তমান অবস্থা, (২) নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে মেয়েদের জীবন।

বর্তমান অবস্থা বলতে বোঝানো হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় পৃথিবী তথা সারা বাংলার পরিস্থিতি।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে। বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণা করে। পাটনায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (AISF)-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষিত হয়। এই 'জনযুদ্ধ' নীতি জাতীয় কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনি। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। এই সময়েই যেমন সোভিয়েত আক্রান্ত তেমনি ভারতীয় সীমান্তে জাপ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় কংগ্রেস জনযুদ্ধতত্ত্বকে না মানলেও তাদের অবস্থান ফ্যাসিবাদের বিপক্ষেই ছিল। সুস্নাত দাশ লিখছেন—''তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গান্ধীজী যে শান্তিবাদী নীতি গ্রহণ করেন তার সারমর্ম হলো—১. জাপানের বিরুদ্ধে অহিংসা অসহযোগ, ২. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহঙ্গে অসহযোগিতা, ৩. ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নৈতিক সমর্থন, ৪. ভারতবর্ষকে সশস্ত্র ও হিংস্র সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করা। এই চতুর্থ নীতিটি জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ ও পোড়া মাটির রণকৌশল গ্রহণের নেহরু নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত হয়।''[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর জাপানী বোমারু বিমান কলকাতার উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং প্রায় তিনশো মানুষ মারা যান। এদের প্রত্যেকেই গরিব বস্তিবাসী নিরীহ মানুষ।

একদিকে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি অন্যদিকে জাপানী আক্রমণ, তার হাত ধরেই তৈরি হয় বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তর।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানত দুটি কারণকেই সামনে আনা হয়—১. প্রাকৃতিক, ২. মনুষ্যসৃষ্ট।

১৯৪২-এর অনাবৃষ্টি ও দেরিতে বর্ষা আসায় ধান চাষে একটা বড় ক্ষতি হয়েছিল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশে চাষ বন্ধ ছিল। এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলায় বন্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে চাষে

ব্যাপক ক্ষতি হয়। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, হুগলি জেলার এই ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল।

প্রাকৃতিক কারণে পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট কারণটাও উপেক্ষা করা যায় না। যুদ্ধের কারণে বাংলায় প্রচুর সেনাসমাগম হয়। যুদ্ধউপকরণ তৈরির কারখানা চালু হলে প্রচুর অবাঙালি শ্রমিক বাংলায় প্রবেশ করে। ১৯৪২-এ ব্রহ্মদেশে জাপানী বোমাবর্ষণ জনিত কারণে অনেক মানুষ ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে বাংলায় এসে আশ্রয় নেয়। ফলে জনস্ফীতি ঘটে মারাত্মকভাবে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ''ইংরেজ শাসক নিছক নিজের স্বার্থে জাপানকে রুখতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঙালির উপর তার এক তিল বিশ্বাস ছিল না, তাই বাজারে সরকারি দৌরাত্ম ঘটল, জাপানীদের হাতে পড়বে ভয় করে চালু হল এক অমানবিক 'Denial Policy' বৃহৎবঙ্গের বহু অঞ্চলে যানবাহনের প্রধান উপায় নৌকা কেড়ে নেওয়া হল, জ্বালামুখী যুদ্ধব্যবস্থার উদরপূর্তির জন্য বাংলার মাটির সর্ববিধ ফসল চলে গেল সরকারি গুদামে আর মজুতদারের গহ্বরে, দেখা গেল অদৃষ্টপূর্ব মুনাফাখোরের ঝাঁক, যাদের কাছে সুনীতি, মানবিকতা, দাক্ষিণ্য বলে কোনো অনুভূতির স্বীকৃতি ছিল না।''[১৫]

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও দু-একটি কারণকে নির্দেশ করা যায়। স্বপন সেনগুপ্ত-র তথ্য অনুসরণে বলা যায়—''১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় চালের উৎপাদন কম হলেও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হবার মতো ছিল না। বহু বছর ধরেই নিজস্ব উৎপাদনে বাংলার চাহিদা মিটত না। নির্ভর করতে হতো বর্মা থেকে আমদানি করা চালের উপর। ১০ মার্চ, ১৯৪২ জাপানিদের হাতে পতন ঘটে বর্মার। ফলে বাংলার চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায় বর্মা থেকে।''[১৬] যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কালোবাজারি, মজুতদারির ফলে বাংলায় নেমে আসে চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ। 'মাগো একটু ফ্যান দাও' ধ্বনিতে ফেটে গিয়েছিল বাংলার নগর প্রান্তর।—এই পরিস্থিতিই তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর'-এর প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে।

তারাশঙ্কর লিখছেন, ''এবার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লিখলাম 'মন্বন্তর'। মন্বন্তরের মধ্যে কম্যুনিষ্টপন্থী কর্মীই নায়ক। কিন্তু এক পৃথক কম্যুনিজম-ধর্মী নায়ক।''[১৭]

'মন্বন্তর' উপন্যাস প্রসঙ্গে যে নতুন আদর্শের কথা বলেছেন, তা হল বামপন্থী আদর্শ। এই সময়কার বামপন্থী আন্দোলনকে তিনি সামনে থেকে দেখেছেন। চিন্মোন সেহানবিশ লিখেছেন, ''বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে তাঁর (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিল বন্ধুত্ব। আর কর্মীদের মধ্যে সুভাষ, সুধীবাবু (শ্রীসুধী প্রধান) ও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। মনে পড়ে একবার তিনি আমায় তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসখানি উপহার দিয়েছিলেন এই কথাগুলি লিখে—ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের

সম্পাদক আমার কমরেড শ্রীমান চিন্মোহন সেহানবীশকে।"[১৮]

১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, তারাশঙ্করের মতো সাহিত্যিককে যথেষ্ট বিচলিত করেছিল। এই সময়কার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, ''ঝড়, জল প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অব্যাহত গতিতে বাঙলার সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আজ বাঙলার চিত্রশিল্পীর মডেল হয়ে উঠেছে—নরকঙ্কাল, গলিত শব, তার চারিপার্শ্বে ক্ষুধার্ত মাংসভুক কুকুর শেয়াল শকুন; সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার মহাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিছক জীবন তাড়নায় মা কোলের ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে, মানুষ সন্তানকে হত্যা করছে—স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রি করছে মানুষ, নারী নিজেকে বিক্রি করছে। বাঙলার মহানগরীর রাজপথে রাস্তায় কঙ্কালের সারি, ছবিঘরের সামনে জনতার ভিড়, তারই মধ্য দিয়ে চলেছে অতিকায় সামরিক যানবাহন, মাথার উপরে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন। সমস্ত কিছুকে স্তব্ধ করে দিয়ে মধ্যে মধ্যে উঠছে সাইরেন।"[১৯]

এই বিষয়গুলিই প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে 'মন্বন্তর' উপন্যাস রচনায়। যুদ্ধের ভয়াবহ উপস্থিতিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অসহায়তা উঠে এসেছে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে।

এই উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট কলকাতা নগরী। এই নগর কলকাতার প্রধানত চারটি পরিবারের কাহিনি তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। ১. বিনাশোন্মুখ চক্রবর্তী পরিবার, ২. শহরতলির এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য বংশের অধঃপতিত সন্তান প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও তার পরিবার, ৩. অন্য দিকে আদর্শবাদী আইনজীবী দেবপ্রসাদ সেন ও তাঁর পরিবার, ৪. কালোবাজারি ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি রায় বাহাদুর বি. মুখার্জীর পরিবার। যদিও উপন্যাসে এই পরিবারটির বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

''সুখময় চক্রবর্তী সেকালে কর্মশক্তিতে পালোয়ান ছিলেন। কলকাতা শহরে পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর বস্তি গড়ে ভাড়াটে প্রজার রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন রামনগর, সোনাগাছি অঞ্চলে। ভাড়াটে বাড়িও করেছিলেন পনেরোখানা; কাঠাখানেক জায়গার উপর প্রকাণ্ড দোমহলা বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে লক্ষ দুয়েক টাকা নিয়ে"[২০] চক্রবর্তী বংশের পত্তন করেন। দ্বিতীয় পুরুষে সুখময় চক্রবর্তীর তিন ছেলেই বিশৃঙ্খল জীবন যাপনের চিহ্ন হিসাবে তাসপাশা খেলা, মদ্যপান, বাঈজি নৃত্য প্রদর্শন, রেসের মাঠে টাকা ঢালা ইত্যাদির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। বংশের দশায় তৃতীয় পুরুষ শেষ পেরেক বসায়, চতুর্থ পুরুষে পতন দৃশ্য প্রকট আকার নেয়। তৃতীয় পুরুষের সাত ভাই ও চার বোনের মধ্যে পাঁচজন পাগল। বাকি কয়েকজন পাওনাদার-তাড়িত গোপন জীবনে অভ্যস্ত। সুখময় চক্রবর্তীর স্ত্রী নব্বই

বছর বয়স নিয়ে জীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত চক্রবর্তী পরিবারেই টিকে আছেন। তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র সেজবাবু মায়ের মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছেন, সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায়। আছেন সুখময় চক্রবর্তীর ছোটো বৌমা, বিধবা ছোটো গিন্নি।

তৃতীয় পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে বেঁচে আছেন সুখময় চক্রবর্তীর বড় ছেলের বড় ছেলে। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র 'কানাই'-এর বাবা। ওই সংসারের একমাত্র ব্যতিক্রম হল কানাই। এম.এস.সি. পাস করেছে টিউশনি করে। সংসারের অনেক দায় সামলায় টিউশনি করেই। রায় বাহাদুর বি. মুখার্জীর ছেলে অশোককে সে পড়ায়। পুত্র ভালোভাবে পাশ করায় বি. মুখার্জী তাকে একশো টাকা পুরস্কার হিসেবে দেন। আর সেই পয়সা নিয়ে কানাই-এর বাড়িতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কানাই রাত্রে ফিরে এসে দেখে, বাবা একটা বোতল নিয়ে মদ খাচ্ছেন, মা অন্নপূর্ণার মতো বাবার থালায় মাংস সাজিয়ে দিচ্ছেন। এরপর কানাই আর সেখানে থাকতে পারেনি। বাড়ির সঙ্গে কানাই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। আর এই রাস্তাতেই যুক্ত হয়েছে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের পরিবারের কাহিনিসূত্র। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষের নাম ডাক বেশ ভালোই ছিল। পিতামহ গুরুগিরি করতেন। পুত্রকে অর্থাৎ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের পিতাকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেও সে সাধ পূরণ হয়নি। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যকে তাঁর পিতা স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করতে মনস্থির করেন। কিন্তু প্রদ্যোৎ সেই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ধরল সেল-পারচেজ বিসনেস—''তখন এই চপকাটলেট খাওয়াটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। তার একদা ব্যবসায় বুদ্ধিতে পরিপক্কতা লাভ করে—বাজারের দেনা ফাঁকি দিয়ে বাজারের পাওনাটা সমস্ত গ্রাসের প্রত্যাশায় ইনসলভেন্সি ফাইল করে—পৈতিক বাড়ী বিক্রি করে স্ত্রীর নামে কলকাতায় তুললে শৌখিন বাড়ী এবং নতুন বাড়িতে বসে—কেবলই ইলিশ-ভেটকির ফ্রাই, মটন-মাংসের কালিয়া কোর্মা, রামপক্ষীর কাটলেট আস্বাদন করে দিনগুলি যাপন করতে আরম্ভ করলে।''[২১] এরপর শুরু হল মামলা। ফল খারাপ হল। ফাঁকি ধরা পড়ল। সব হারিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানোর মতো অবস্থা। চাকরি একটা জুটল বটে কিন্তু যুদ্ধের বাজারে তাও টিকল না। চক্রবর্তী বাড়ি লাগয়ো বস্তিতে জুটল একটা ঠাঁই। বাড়িতে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ছাড়াও স্ত্রী সরোজিনী কন্যা গীতা ও পুত্র হীরেন। অভাবের ঢেউ আছড়ে পড়ে সংসারে। সাময়িক উদ্ধারে কুটনি বামুনদি এগিয়ে আসে। কৌশলে কুমারী মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘৃণ্য দেহব্যবসায় নামানো যার কাজ। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের কন্যা গীতারই রেহাই মেলে না বামুনদির থেকে। পচনশীল বিলাসীর গৃহ পরিত্যাগ করে কানাই যখন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, সেখানেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে সদ্য সর্বনাশ ঘটে যাওয়া ধর্ষিতা গীতার সঙ্গে।

কানাই সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি, কেননা গীতা কানাই-এর বোন উমার বান্ধবী। ''কানাই গীতার হাত ধরে মহানগরীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অজানিত ভবিষ্যতের মধ্যে ভেসে পড়ল।''[২২] উঠল গিয়ে বিজয়দার বাসায়। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের কন্যা গীতা-ই শুধু তৎকালীন বড়লোক কুপাত্রের লালসার শিকার শুধু না, বামুনদি তার মায়ের অর্থাৎ সরোজিনীর আত্মমর্যাদাও বিকিয়ে দিয়েছে গীতার সর্বনাশকারীর কাছে। তারপর পথভিখারির বৃত্তিতে হারিয়ে গেছে সরোজিনী।

কলেজে একই সঙ্গে লেখাপড়া করতো কানাই আর নীলা। একই রাজনৈতিক কর্মের সহযোগী নীলার ভাই নৃপেন ওরফে নেপীও রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত। নীলা-নেপীর বাবা দেবপ্রসাদ সেন, দর্শনশাস্ত্রে এম.এ.। ওকালতিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। নীলা-নেপী ছাড়াও দেবপ্রসাদের বড়ছেলে অমরও এম.এ. পাশ কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুবিধা করতে না পেরে মাস্টারি করছে। বিবাহিত একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। নীলা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়েছে। নেপী বিএসসি পড়ছে। নীলা-নেপী দু-জনেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মী। নেপী রাজনৈতিক কর্মের অঙ্গ হিসেবে সেবাকর্ম নিয়েই বেশি ব্যস্ত। দেবপ্রসাদের সনাতন মনোভঙ্গির সঙ্গে নীলার আধুনিক মনোভঙ্গির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। স্টুয়ার্ট আর ম্যাকেঞ্জি নামে দুই শিক্ষিত ব্রিটিশ সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ হয় নীলার। তাদের সঙ্গে থিয়েটার হলে দেখে দেবপ্রসাদ নীলাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। অভিমানে নীলা দেবপ্রসাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসে, অপরদিকে, দুঃখ ক্ষোভ অভিমান নিয়ে দেবপ্রসাদও সংসার ত্যাগ করেন। নীলা-নেপীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে দেবপ্রসাদ লিখে যান—''...তোমরা সত্যকার জাতিত্যাগী—ধর্মত্যাগী; আমার বহু পুরুষের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত যে মহনীয় কুলগৌরব, তাকে তোমরা খর্ব করেছ—তাকে তোমরা ত্যাগ করেছ—তোমরা কুলত্যাগী। তোমাদের চিত্তের শুচিতা নেই, চিন্তার সততা নেই, নীতিধর্মকে বর্জন করে কূটকৌশলকে তোমরা জীবনধর্ম করে তুলেছ।''[২৩] নীলা-নেপীও আশ্রয় নিয়েছে বিজয়দার বাসায়।

আর একটি পরিবার এই উপন্যাসে, অপ্রধান ভূমিকা পালন করেছে সেটি হল কালোবাজারি শিরোমণি রায় বাহাদুর বি. মুখার্জীর পরিবার। কেমনভাবে আকালের বাজারে পণ্যকে মজুত করতে হয়, কেমন করে তা বেশি দরে অন্যত্র বিক্রি করে মুনাফা বৃদ্ধি করতে হয় সে বিদ্যা বি. মুখার্জী এবং তার সন্তান অমলবাবুর ভাল করেই জানা। এই অমলবাবুর সঙ্গে কানাইও কিছুদিন পার্টনারশিপে কাজ করেছে, কিন্তু যখন জানতে পেরেছে এই অমলবাবুই গীতার সর্বনাশকারী তখন ঘৃণার সঙ্গে সেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক ত্যাগ করে

বেরিয়ে এসেছে কানাই।

এই চারটি প্রধান অপ্রধান পরিবারের বাইরে থাকছে আর একটি আশ্রয়। সেটি হল বিজয়দার বাসা। প্রায় সব কাহিনির প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সূত্র এসে হাজির হয়েছে বিজয়দার বাসায়। বিজয়দা একটা দৈনিক ইংরাজি কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদক। ''বাংলাদেশের সাময়িকপত্রের আসরে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভাগ্যাকাশ', 'ঘনঘটা', 'ঘোর ঝঞ্ঝা', 'মহাকাল', 'তমসারূপিনী কালিকা' নিয়ে ফেনোচ্ছ্বাসিত বাংলাদেশের সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে ফেনোচ্ছ্বাস বর্জিত যুক্তিতর্কের প্রখর স্রোতসম্পন্ন লেখাগুলি পড়লেই সকলে বুঝতে পারে—এ লেখা বিজয়বাবুর।[২৪] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলেজে পড়াকালীন বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পড়া ত্যাগ করে ১৯২১ নাগাদ অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩০ নাগাদ অধ্যাপনায়। ওই বছরই গণআন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস। ''বর্তমানে রাজনীতিতে বিজয়দা সাম্যবাদী—কমিউনিস্ট।''[২৫] বিজয়দার বাড়িটা যেন একটি কমিউন। সবাই খেটে খায়। ভাড়া ও খাবার খরচের পয়সা যারা রোজগার করে তারাই দেয়। কানাই, গীতা, নীলা-নেপীরা প্রত্যেকে পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই কমিউনে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেই তারা কর্মক্ষেত্রে যায়, রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'মন্বন্তর' গ্রন্থে লেখকের ''ওপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ''[২৬] করেছেন, এবং তারাশঙ্করকে সাংবাদিকের ভূমিকায় বিচার করেছেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে কাহিনির একটা বুনট আছে, মূল কাহিনি, উপকাহিনি সুঠাম গঠন তার মিলন ইত্যাদি দেখা গেছে কিন্তু তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের যে অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তাতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে অনেকাংশে সমর্থন করতে হয়।

যুদ্ধ, মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি ইত্যাদি সমসাময়িক সমস্যা উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয়ভিত্তি। দুর্ভিক্ষের অনেক কারণের একটা কারণ যুদ্ধ, যুদ্ধের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীদের কালোবাজারির সুযোগ, কালোবাজারিও দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। দুর্ভিক্ষের সুযোগে কালাবাজারি তার অন্যান্য কুলক্ষণগুলির অন্যতম নারীর ইজ্জত ছিনিয়ে নেওয়া তা ঘটেছে। নিম্নতর মানুষের টিকে থাকার অধিকারও নেই, যদি টিকে থাকতে হয় তবে আত্মমর্যাদা বিকিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে বেঁচে থাকতে হবে কারণ দেশের সরকার এখন যুদ্ধে মেতেছে। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ বোমার হুঙ্কার আর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এই ছিল তৎকালীন নিম্নবর্গের মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই বিষয়গুলি কাহিনির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

সমালোচক নাজমা জেসমিন চৌধুরীর মতে 'মন্বন্তর'-এ তারাশঙ্করের ''সাম্যবাদী চিন্তাধারার অসংগতি ছিল।''[২৭] এ কথা তো অনেকাংশে সঠিক। তারাশঙ্কর আমৃত্যু ছিলেন

গান্ধীবাদী, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল। সমকালীন আন্দোলনের অভিঘাত কয়েকজন বামপন্থী মানুষকে তারাশঙ্করের কাছে এনে দিয়েছিল; কিন্তু সেই বামপন্থী বন্ধুদের মনোভঙ্গিতে যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজারি কোন দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছিল তার হদিস তারাশঙ্কর পাননি। তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলন কর্মসূচির সঙ্গে লেখকের কোথায় মিল কোথায় অমিল একটু মিলিয়ে দেখা দরকার।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত ১৯৪০-এর ৩০ ডিসেম্বরের কমিউনিস্ট পার্টির চিঠি থেকে কিছু তথ্য দিয়েছেন, সেগুলির কিছু অংশ আমরা আলোচনার জন্য তুলে দিচ্ছি—(১) ''দুর্ভিক্ষের আঘাতে বাংলায় আনুমানিক দেড় কোটি লোক দুঃস্থ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বোধহয় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়া গিয়াছে, বাকি এক কোটি এখনও দুঃস্থাগারে। ইহাদের অধিকাংশই কৃষি মজুর কিন্তু কাজ করিতে তাহারা অক্ষম।''[২৮]

(২) ''দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধি, বিশেষত ম্যালেরিয়া। ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের মতো এই ম্যালেরিয়া সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। অথচ উপযুক্ত পরিমাণে কুইনিন সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। লোভী মজুতদারেরা কুইনিন মজুত করিয়া চোরা কারবার চালাইতেছে। ত্রিশ টাকার কুইনিন তিনশত টাকায় বেচিতেছে।''[২৮]

(৩) ''শহরে চাউল এখনও দুষ্প্রাপ্য, দাম আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে অথচ পুরো রেশনিং এখনও চালু হয় নাই।''[২৮]

এই সকল তথ্য তারাশঙ্করের অজানা ছিল না। তিনি এই বিষয়গুলির অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন কাহিনি নির্মিতির সঙ্গে সঙ্গে।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, নাগরিক ও গ্রামীণ—উভয় অংশের মানুষের জীবনেই মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। বোমার ভয়ে মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল মফঃস্বলগুলিতে আর গ্রামের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের দল ভিড় বাড়াচ্ছিল কলকাতায়। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেবপ্রসাদের ভাষ্যে বিষয়টি ধরা পড়েছে—

''কত সাধ কত আশা নিয়ে এরা সব এখানে এসে আপন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নিয়ে জীবনের বীজ বপন করেছিল, কারও বীজ হতে অঙ্কুর হয়েছিল, অঙ্কুর হতে মেলেছিল পাতা—কারও কারও জীবন তরীতে ফুল ধরেছিল, ফলভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল কত জীবনতরু, সব ভেঙেচুরে ওলটপালট করে দিয়ে গেল কাল যুদ্ধ। আবার কত নিরন্ন এই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে ছুটে আসছে কলকাতায়, দুটো উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশায়।''[২৯]

'মন্বন্তর' উপন্যাসের পাতায় একটি বিষয় খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক,

নীলা, বিজয়দার সংগ্রহের বিভিন্ন খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা দেখতে দেখতে একটি সংবাদে নজর পড়ে। ''ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির সমালোচনা হয়েছে। সে পাতা উল্টে দিলে। সম্পাদকীয় মন্তব্যের পৃষ্ঠা। এখানেও একটা ছবি। ছবিটা ভাল লাগল। রণদানব পাক দিয়ে দিয়ে নাচছে, তার গায়ে লেখা ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩—এইবার সে মাটির দিকে চেয়ে তুড়ি দিয়ে বলছে—এসো এসো। মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কালসার, ক্রুদ্ধদৃষ্টি, লোলুপ হাঁ করা, প্রায় নগ্না এক বিভীষিকাময়ী নারীমূর্তি। সে দুর্ভিক্ষ। তার পায়ের তলা থেকে আরও একটা মুখ উঁকি মারছে। সে মুখে আবার চামড়ার আবরণও নাই—সে মহামারী। আকাশে উড়ছে চিল শকুনি, গোলা ফাটছে, প্লেন উড়ছে ধোঁয়ায় সূর্য দেখা যায় না, সমস্ত ঝাপসা। নীচে লেখা নববর্ষ—১৯৪৩।''[৩০]

ঔষধের অগ্নিমূল্য তৎকালীন মধ্যবিত্ত সংসারকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল সে চিত্রও তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, গুণদাবাবুর স্ত্রী তার সন্তানের অসুস্থতার ঔষধের অপ্রাচুর্যতা ও অত্যধিক দামের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—''বাবুরই এক বন্ধু ডাক্তার। আমাদের বাড়িতে বরাবরই দেখেন। বাবুকে খুব ভালবাসেন। তবে মুশকিল হচ্ছে—ওষুধ যে অগ্নিমূল্য আর দাম দিয়েও তা পাওয়া যাচ্ছে না।''[৩১] নগর কলকাতাতেও রেশনিং ব্যবস্থার করুণ অবস্থাও ধরা পড়েছে গুণদাবাবুর স্ত্রীর কথাতেই—''টাকার আর কোনো দাম নাই আমার কাছে। আজ তিনদিন ঘরে চাল নেই। তিনদিন আগে নীচের পানওয়ালা কিউয়ে দাঁড়িয়ে চাল এনে আমাকে দিয়েছিল। পরে শুনলাম লোকটার নিজের ঘরে হাঁড়ি চাপে নি।... আটাও নেই, চিনিও নেই। শুধু আলুর তরকারি আর খেতে পারছি না। ছোট ছেলেটা তো ভাত ভাত করে দিন রাত—চিৎকার করছে।''[৩২]

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময়কার প্রেক্ষিতকে যেভাবে দেখেছেন তারাশঙ্করের মনোভঙ্গি অনেকটা এক। তারাশঙ্কর বলেছেন, তাঁর কল্পনার নায়ককে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিজয়দা, কানাই, নীলা, নেপী—এরা সবাই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। বিজয়দা কাগজের কলামিস্ট, কর্মীদের অভিভাবক, কানাইকে শুধু বক্তৃতা করতে দেখেছি তাছাড়া পার্টিগত তার অ্যাকশন খুবই কম, নীলা ছাত্র সমিতির কাজকর্ম করেছে, বর্তমানে কমিউনিস্ট সংগঠক। পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণ করতে দেখেছি শুধু নীলার ভাই নেপীকে। রিলিফের কাজ সে বেশিই করেছে। বন্ধনহারা, কলকাতা ছাড়িয়ে সারা বাংলা জুড়ে সে ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৎকালীন কমিউনিস্ট কর্মীদের দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্যে ঝাঁপিয়ে অংশগ্রহণকে তারাশঙ্কর খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। 'উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থে তৎকালীন ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব কমল

চ্যাটার্জির একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিকে আমরা আলোচনার জন্য দেখতে পারি—''তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আমাদের কাছে যেন দেবতার আশীর্বাদের মতো। রিলিফের কাজের মাধ্যমে আমরা মুষড়ে পড়া কংগ্রেসী ছাত্রদেরও কাছে টানার চেষ্টা করি। মনে রাখতে হবে যে সময় আমাদের অবস্থা জটিল—প্রায় নিঃসঙ্গ। আমরা লোকের সেবা করতে চাই—দেশ স্বাধীন করতে চাই—অথচ পড়ে গিয়েছি উল্টো দিকে। আমরা তখন সেবাকার্যের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছাকাছি থাকতে পেরেছি।''[৩৩] ওই একই গ্রন্থে গোবিন্দ কাঁড়ারের অভিমতও ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—''বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা দেখেছি কমিউনিস্ট কর্মীরা নিজেরা দিনের পর দিন অভুক্ত অর্ধভুক্ত থেকে নিরন্ন মানুষদের লঙ্গরখানার রান্না করে খাইয়ে গেছেন মাসের পর মাস।''[৩৪]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় অংশ নিয়েছিলেন। তার উল্লেখ করে চিন্মোহন সেহানবিশ লিখছেন—''ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে কারান্তরাল থেকে জাতীয় নেতাদের মুক্ত করার সংগ্রামে আমরা সেদিন সর্বদাই তারাশঙ্করবাবুকে পেয়েছি আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে।[৩৫] 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সে বিষয়ে যথেষ্ট বর্ণনা করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর নায়কদের কর্মসূচিতে ওই আন্দোলন কর্মসূচিকেও যুক্ত করেছিলেন,—''মৃদু হাসি ফুটে উঠল কানাইয়ের মুখে—ব্যঙ্গের নয়, স্নেহের হাসি, নেপীকে সে বড় ভালবাসে। নীলার পাগল ভাই নেপী। নেপী পৃথিবীর মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। দিন নাই—রাত্রি নাই—নিদ্রা নাই, প্যাম্ফলেট বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিলি করছে দেওয়ালে আঁটছে, বুভুক্ষুর দলকে ডেকে ডেকে মিছিল করছে, সমস্ত অন্তর ফাটিয়ে চীৎকার করছে—মানুষের জন্য রুটি চাই, ভাত চাই। তার জন্য আপনার সাধনার দীর্ঘ জীবন কামনা করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।''[৩৬]

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অভিশাপ, তার অনাচার, পচনশীল অবস্থাকে তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। সমাজ বিকাশের ধারায় যা অবশ্যম্ভাবী সত্য। সুখময় চক্রবর্তীর পরিবার-এর পতনশীল অবস্থাকে দেখিয়েছেন, সেখান থেকে মুক্তি খুঁজেছে তাঁর নায়ক—কানাই। কমিউনিস্ট কার্যক্রমের মধ্যে, বিজয়দাদের সান্নিধ্যে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য তাঁর পরিণতিও এখানে দেখানো হয়েছে। কালোবাজারি ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা উগরে দেওয়া এগুলি তো মার্কসবাদের নিয়ম বহির্ভূত নয়।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে জাপানের বোমা বর্ষণ, শত শত বস্তিবাসীর প্রাণ হারানো, ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপকে তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে—

''চট্টগ্রামের ওপর শত্রু অর্থাৎ জাপানী বিমান হানা দিয়েছিল। দুবার হানা দেয়।

সকালে একবার এবং পুনরায় দেয় সন্ধ্যার পর। দুবারই অবশ্য তারা অল্প কয়েকটি বোমা ফেলে যথাসম্ভব সত্ত্বর চম্পট দেয়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিক জানা যায়নি।"[৩৭] কলকাতাতেও জাপানী বোমা পড়লে মারা যায় শতাধিক বস্তিবাসী। নেপীর কথাতেই তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেপী কানাইকে বলেছে—''হ্যাঁ। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য কানুদা। একটা বস্তির উপর বোমা পড়েছে। কতকগুলি নিরীহ হতভাগ্য—উঃ, সে কি দৃশ্য—কারও হাত গেছে, কারও পা গেছে কারও বুক কারও পিঠে সপ্লিন্টার ঢুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। বস্তির মধ্যে কাটা হাত-পা আঙুল এখনও পড়ে আছে।"[৩৮]

অক্ষশক্তির ভয়াবহ রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। তৎকালীন কমিউনিস্টরা এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধেই তাদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করেছিল।

বোমাবিধ্বস্ত কলকাতার একটা জনঅংশ তৎকালীন কমিউনিস্ট কর্মীদের 'রাশিয়ার দালাল', 'রুশো বেঙ্গল' বলে কটাক্ষ করলেও তারাশঙ্করের চোখে তাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে। উপন্যাস অংশেই তিনি লিখেছেন, ''ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে এসে ট্রাম ঘুরল। স্কোয়ারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে একটি জনতা। হাতে পতাকা, কাগজে লেখা নানা বাণী। এর মধ্যে মানুষ সত্যকার মুক্তি খুঁজছে।"[৩৯]

পতনশীল চক্রবর্তী বাড়ি ছেড়ে কানাই-এর চলে অসা অথবা পতনশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আবর্জনা স্বরূপ প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর সংসার ত্যাগ করে গীতার চলে আসায় তারাশঙ্করের সমর্থন আছে। কিন্তু নীলা নেপীর, গান্ধীবাদের আদর্শে দীক্ষিত পিতা দেবপ্রসাদ সেনকে ছেড়ে আসাটাকে তারাশঙ্কর সেভাবে সমর্থন করতে পারেননি। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের বিশ্বনাথের মনোভঙ্গীর সঙ্গে লেখক নীলা নেপীকে অনেকটা মিলিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীবাদের প্রতি মমত্ববোধ এখান থেকেই আমরা দেখতে পাই পরিণতিতে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে।

প্রেক্ষাপট নির্বাচনে, তৎকালীন কমিউনিস্টদের আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের ছাপ আমরা লক্ষ করি কিন্তু চরিত্র পরিকল্পনা ও তাদের পরিণতিতে আমরা অন্যরূপ দেখি। কমিউনিস্ট কর্মীর পরিণতি ঘটছে গান্ধীবাদ বিশ্বাসে। অসংগতিপূর্ণ, অমার্কসীয়। এই প্রসঙ্গে—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—''কম্যুনিজমকে কখনও নিজের জীবন দর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেননি, বরং ছিল গান্ধী চিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ, কিন্তু বিচিত্র বর্গের বাঙালি জীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান এই যশস্বী কখনও সমসমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেননি, বৈরী শিবিরেও মিশে যাননি।"[৪০]

তারাশঙ্কর নতুনকালের চরিত্রের প্রতি অবিচার করেননি, সহানুভূতির চোখেই তাদের নির্মাণ করেছেন। কিন্তু নতুন কাল তাঁর উপন্যাসে উঠে এলেও নতুন চরিত্ররা ঠিক নবভাবনায় উদ্ভাসিত হল না।

এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের নিজের কথাকেই আলোচনার সূত্রে আনা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, মন্বন্তরে কমিউনিস্ট কর্মীগণই নায়ক—''কিন্তু এক পৃথক কম্যুনিজম্-ধর্মীনায়ক।''[৪১] নীলা, নেপী এরা কমিউনিস্ট কর্মী; গান্ধীবাদী পিতার সংসার ছাড়ল, নতুন ভাবনায় ভাবিতরা নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিভোর, তারা গান্ধীর অনশন প্রত্যাহারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। নাজমা জেসমিন চৌধুরী লিখেছেন—''গান্ধীজী পার হলেন তাঁর অগ্নিপরীক্ষায়, কিন্তু নীলা নেপী তাদের সাম্যবাদী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল।''[৪২]

কানাই নিজের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের অভিশাপমুক্তি ঘটিয়েছে—নিজের রক্তপরীক্ষায় সে জেনেছে সে নির্দোষ। এসেছে নতুন মতবাদের আশ্রয়ে। কিন্তু মার্কসীয় মতাদর্শ কানাই ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। বারবার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগিয়ে তা সে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে। কানাইকে আমরা দুবার বক্তৃতা করতে দেখেছি তাও সে বক্তৃতায় ভাববাদের জোয়ার বয়েছে। ভাববাদী কমিউনিস্ট বলে যদি কিছু হতো তবে কানাই সেই পরিচিতিটাই লাভ করতো।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে বিজয়দা নতুন ভাবধারায় লালিতদের অভিভাবক। গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের খবরে নীলা, নেপী, গুণদাবাবুর স্ত্রীর মতোই তিনিও অভিভূত। তিনি বলেছেন, ''পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে।... ভয় মিথ্যা, মিথ্যার বিলুপ্তিতেই সত্যের প্রকাশ; ভয়কে সে জয় করেছে চিরদিনের মতো। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা—তুমি চিরায়ু লাভ কর।''[৪৩] বিজয়দা আশা প্রকাশ করেছেন, বিশ্বযুদ্ধে সমাপ্তি আছেই সেই সমাপ্তিতেই আসবে নববিধান।—''সে নব বিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র, তাতে কেউ আনবে বৈষম্যমুক্ত সমাজ রচনার সূত্র, কেউ আনবে জড় বিজ্ঞানের মহাজ্ঞান, বিশ্বরূপের পরিচয় কথা—কতজন আনবে কত বাণী।''[৪৪] শোষণমুক্ত সমাজ, বিশ্বাত্মবোধ সবই উঠে এল বিজয়দার কথায়। এই ভাবপ্রবণতা অবশ্যই মার্কসীয় ভাবধারা নয়। বিজয়দার কথাতে মার্কস-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের এক সমন্বয় লক্ষ করা গেছে। উপন্যাসের শেষ অংশে নেপী যখন পিচবোর্ডে লেখে ''নিরন্নকে অন্ন দাও'' তখন উপরিউক্ত সমন্বয়ে বিবেকানন্দও যুক্ত হয়ে যান। 'পৃথক কম্যুনিজম্ধর্মী নায়ক' বলতে তারাশঙ্কর উক্ত সমন্বয়ী চিন্তাপ্রসূত নায়ককেই উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

তারাশঙ্কর নিজেই লিখেছেন, ''১৯৩০/৩১ সালে জেলের মধ্যে বন্দীদের আলোচনা আসরে কম্যুনিজম্ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনেও যা শিখলাম জানলাম, তাও এক স্বপ্নরঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ—তার ভিতরের আসল তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানি নি। নিজেই নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী কম্যুনিজমের এক রূপকে তৈরি করে নিয়ে তাকেই তার স্বরূপ বলে ধরে নিয়েছিলাম।''[৪৫] পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিগত শতকের চল্লিশের দশকে তারাশঙ্কর-এর কমিউনিস্ট সংস্রব ঘটে, পরে আবার কমিউনিস্টদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মার্কসবাদকে তাঁর প্রথম থেকেই 'স্বপ্নরঙিন আদর্শবাদ' বলে মনে হয়েছে, এবং মার্কসবাদকে উপলব্ধি করেছেন, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাহলে গান্ধীবাদী চেতনার রঙে উপলব্ধ মার্কসীয় দর্শন তো বিজয়দাদের জন্মই দেবে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'কী চেয়েছি, কী পেয়েছি', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রন্থিত রচনাবলী*, ঘোষ, বারিদবরণ (স.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১৬ ব., পৃ. ১৫৬

২. দাস, প্রভাতকুমার, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনপঞ্জি*; মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার (স.), *তারাশঙ্কর সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৯৬

৩. তদেব, পৃ. ৮৯৭

৪. ভৌমিক, তাপস ও রায় বর্মণ, পার্থ (স.), *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনকথা*, মানস মজুমদার, *কোরক*, তারাশঙ্কর সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩০

৫. দাশ, সুস্নাত, 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও তারাশঙ্কর', *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (স.), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮২৫

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'সংগ্রাম ও শিল্পী', *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রন্থিত রচনাবলী*, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ২০৪

৭. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১১১

৮. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*; দেজ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৮৫

৯. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'তারাশঙ্কর : রাজনৈতিক সত্তা থেকে লেখক সত্তা', *কোরক*, তারাশঙ্কর সংখ্যা, তাপস ভৌমিক-পার্থ রায় বর্মণ (স.), কলকাতা, পৃ. ১০৪

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রন্থিত রচনাবলী, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ১৬০

১১. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'তারাশঙ্কর-শাস্ত্রধর্মে, মানবধর্মে', *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (স.), রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮১১

১২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (স.), *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১১, ভূমিকা অংশ
১৩. তদেব
১৪. দাশ, সুস্নাত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১০০
১৫. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৬১
১৬. সেনগুপ্ত, ড. স্বপন, *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা*, জ্ঞানচিন্তা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০০৪, পৃ. ১৪
১৭. শিল্পীর স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
১৮. সেহানবিশ, চিন্মোহন, 'তারাশঙ্কর স্মৃতি', *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (স.), রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭০
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'মন্বন্তর ও সাহিত্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', অগ্রন্থিত রচনাবলী, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ১৮৯
২০. ভট্টাচার্য, জগদীশ (স.), *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ১০১
২১. তদেব, পৃ. ১১৬
২২. তদেব, পৃ. ১৪২
২৩. তদেব, পৃ. ২৫৬
২৪. তদেব, পৃ. ১৪৩
২৫. তদেব, পৃ. ১৪৩
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৬২
২৭. চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ১৩৩
২৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৫-২৬
২৯. *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৩০. তদেব, পৃ. ২৬২
৩১. তদেব, পৃ. ২৬৮
৩২. তদেব, পৃ. ২৬৭
৩৩. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৭
৩৪. তদেব
৩৫. সেহানবিশ, চিন্মোহন, 'তারাশঙ্কর স্মৃতি', *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (স.), রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৭০
৩৬. *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
৩৭. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩৮. তদেব, পৃ. ২২৩

৩৯. তদেব, পৃ. ২৪৩
৪০. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪৫
৪১. শিল্পীর স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
৪২. চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৪৩. *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯
৪৪. তদেব, পৃ. ২৮৯
৪৫. শিল্পীর স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-৬১

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

■ **জাগরী** (১৯৪৫)

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর অধুনা বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভট্টবাজারে সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম। পিতা অধ্যাপক ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ও মাতা রাজবালাদেবী। সতীনাথ ছিলেন পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। ছোটোকাল থেকেই মেধাবী সতীনাথ ছিলেন পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের ছাত্র। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে ডিভিসন্যাল স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাশ করেন এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক হন। ওই বছরই মাতা রাজবালাদেবীর মৃত্যু হয়। স্বপ্ন ছিল বিলেতে গিয়ে আই.সি.এস. হবার, কিন্তু পিতার অনুমতি মেলেনি। পাটনায় ফিরে গিয়ে এম.এ.-তে ভর্তি হন এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পাটনা ল কলেজ থেকে বি.এল. ডিগ্রি নিয়ে পূর্ণিয়ার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র হিসাবে আইন ব্যবসায় যুক্ত হন। সাত বছর আইন ব্যবসায় যুক্ত থাকলেও ঐ ক্ষেত্রে বেশিদিন মনোনিবেশ করতে পারেননি। পড়াশুনার টান ছিল প্রবল। ''বার লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রায়শই তিনি বইয়ের কালো অক্ষরের মধ্যে ডুবে যেতেন। কেবলমাত্র আইনের বই নয়, বিচিত্র বিষয়ের প্রতি সতীনাথের কৌতূহল ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য—নানা বিষয়ে তাঁর পড়াশুনা ছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এছাড়া নতুন ভাষা শেখার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।''[১] ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তেত্রিশ বছর বয়সে যোগ দেন 'সর্বপূজ্য সর্বোদয় নেতা' বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টির আশ্রমে। দীর্ঘ নয় বছর রাজনীতিতে থাকার পর তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তারপর কিছুদিন কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টিতে থাকার পর একেবারে রাজনীতি থেকে সরে আসেন। এই নয়-দশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় তথা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করেছেন গান্ধীজির নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে জাতীয় রাজনীতিতে তর্কবিতর্ক, মতবিরোধ, দ্বিধা ইত্যাদি। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ—কে বেশি

শত্রু জওহরলাল প্রমুখদের মতে দুই-ই সভ্যতার বিপদ, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই প্রয়োজন, কমিউনিস্টরাও তাই মনে করতো। অন্যদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে রামগড় অধিবেশনে (১৯৪০) সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাতে ঘোষণা করা হয়, এক ভাইও যুদ্ধে দেব না, এক পাইও যুদ্ধে দিয়ে সাহায্য করব না। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন গোটা ভারতে উত্তাল তরঙ্গ তোলে। অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনের জোয়ার, নৌ বাহিনীর বিদ্রোহ, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রভৃতি ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে একের পর এক আসে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সতীনাথের ঘোষণা—''কংগ্রেসের কাজ ছিল ইংরাজ রাজপাটকে উৎখাত করা, তা হয়ে গেছে। কংগ্রেসের এখন রাজকাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই।''[২]

জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর চিন্তাভাবনার বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায় অনেক আগে থেকেই। তৎকালীন কংগ্রেসি রাজনীতির কিছু কিছু নেতিবাচক দিক তিনি তাঁর সংবেদনশীল মনে মেনে নিতে পারেননি। সোশ্যালিস্ট পার্টির ড. বীরেন ভট্টাচার্য লিখছেন, ''সতুদার মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। রাজনীতির দলাদলি, স্বার্থপরতা, নীচতা সবকিছু তাঁকে কেমন উন্মনা করে ফেলে।''[৩] ড. ভট্টাচার্যের দেওয়া আরও কিছু তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি সতীনাথ মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম্ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। নিরন্ন, পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল প্রবল। তৎকালীন সি.এস.পি. নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ লিখছেন—''তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের দুঃখে দ্রবীভূত হয়ে যেত। সমাজবাদের মধ্যে তিনি দারিদ্রের মুক্তির পথ দেখতে পান। তার ফলে আমার সহকর্মী হয়ে চলে আসেন।''[৪] তৎকালীন সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্যদের মার্কসবাদ নিয়ে উৎসাহ ছিল, বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির নানান দিক তাঁরা রপ্ত করেছিলেন, যেমন 'কমরেড' বলা, 'লাল টুপি' পরা ইত্যাদি। উপরিউক্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে সতীনাথের কথাসাহিত্যে। আমাদের আলোচনার আগে আমি দেখব অন্যান্য কোন কোন উপন্যাসে তাঁর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কী রূপ প্রতিফলন ঘটেছে।

'জাগরী'কে বাদ রাখলে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'। সাহিত্যিক সমালোচক গোপাল হালদার লিখেছেন, ''যদি কোন একটি বই থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি মানুষটিকে চিনতে হয়, আমি হয়ত জাগরী ছেড়ে ঢোঁড়াই চরিতমানস-কে উল্লেখ করতাম।''[৫] ঢোঁড়াই চরিতমানসে আমরা লক্ষ্য করেছি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একই মানসিকতার মানুষদের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেমন শনিচর প্রমুখদের সঙ্গে ঢোঁড়াই একসঙ্গে কাজ করতো 'পাক্কী'র উপর। কাজের মধ্য দিয়ে তারা আপনার হয়ে উঠেছিল। সতীনাথের এই সম্পর্ক বিষয়ে লিখেছেন, ''সে সম্বন্ধ কোন দিন যাওয়ার নয়।'' এই

চিন্তা সতীনাথের মার্কসবাদ চিন্তার ফসল। এমনই একটা সমবায় ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এর অভিমন্যু ও মীনাকুমারীর মধ্যে। ইউনিয়ানের আয় বাড়াতে অভিমন্যু চিনি বা গুড়, চিনাবাদামের কুচি, যেমন ছোটো এলাচ ও অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণে 'কেসর পাক' তৈরি করতো। আর এগুলি দিয়ে আসা হতো অনাথ আশ্রমে। সেখানকার ছেলেরা এগুলি বিক্রি করতো। আর সেই সূত্রের যোগাযোগ হয় উপন্যাসের নায়িকা মীনাকুমারীর সঙ্গে। তারপর ঘনিষ্ঠতা। রাজনৈতিক ঝড় তাদের সম্পর্কে ছেদ ঘটালো। এই উপন্যাসে শ্রমিকশ্রেণি মজুর শোষণ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। '' 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে সতীনাথ শ্রমিক জীবনের ছবি বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের জটিলতাগুলোকেও ঠিকঠাক চিহ্নিত করেছেন—এসবই সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হবে মালিকদের শোষণ বা শ্রমিকদের লড়াই এসব ছাপিয়ে উঠেছে ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসায়তার অন্বেষণ।"[৬]

লেখকের জীবনদর্শন, তাঁর রাজনীতি চেতনা, সেই চিন্তা চেতনার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্র, স্পষ্টতা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি দানা বেঁধেছে তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'জাগরী'তে। সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করবো। সেই আলোচনায় উঠে আসবে তৎকালীন রাজনীতিতে মার্কসীয় চেতনার প্রকাশ, মার্কসীয় রাজনীতি বিষয়ে লেখক সতীনাথের চিন্তার বিভিন্ন দিক।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। বহু চর্চিত ও সমালোচিত উপন্যাস। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সতীনাথ লিখেছেন, ''রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোন কোন স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।"[৭] 'জাগরী' এই রাজনৈতিক পরিবারের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবা গান্ধীবাদী, নিজের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করলেন গান্ধী আশ্রম। বাবার প্রতি বিশ্বাস সর্বোপরি নির্ভরতার কারণে মা-ও তাঁর অনুগামিনী। তিনি হন আশ্রমমাতা। ''তিনি আশ্রমমাতা হয়েছিলেন, সেই কারণে ঠিক যে কারণে সহমরণে যেতেন মনে মনে পঙ্গু হয়ে যাওয়া ভারতীয় নারী। ততটা কঠিন কাজ করতে হয়নি এই উপন্যাসের মা-কে। কিন্তু কারণটা একই—স্বামীদেবতার অনুসরণ।"[৮] গান্ধীবাদী পিতামাতার দুই পুত্র বিলু ও নীলু শান্ত, মেধাবী, মননির্ভর, সংবেদনশীল বিলু। বাবা তাকে পড়িয়েছেন কাশী বিদ্যাপীঠে। এই প্রতিষ্ঠানের অচলায়তনিক শিক্ষায় বিলু সন্তুষ্ট থাকেনি। পিতার একপ্রকার অমতে নিজের খরচে ছোটোভাইকে বি.এ. পাশ করিয়েছে কলেজে পড়িয়ে। রাজনীতির জাগৃতির সঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের যে সংঘাত তা বিলু অনুভব করল আগে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটছিল। তারই ফলস্বরূপ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সেই পার্টিতেই যোগ দেয় উপন্যাসের বিলু। নীলু যোগ

দেয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশ বাবা, মা, বিলুকে গ্রেপ্তার করে রেখেছে জেলখানায়। একমাত্র মুক্ত কমিউনিস্ট নীলু। নীলুর মুক্ত থাকার কারণ ''কমিউনিস্টরা তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক। ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন, কারণ মিত্রশক্তির অন্যতম ব্রিটেন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে।''[৯] কমিউনিস্ট নিলু দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার বিচারে বিলুর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের দিন বিলু কারা কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে দাদার মৃতদেহ নেবার অপেক্ষায়। যদিও ফাঁসির খবরটা ছিল ভুল। ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে গেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী উপন্যাসটিকে আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়তে বলেছেন। ''তাই বিলু ও নীলুর দ্বন্দ্ব দুই ব্যক্তির বিরোধ নয়, হওয়া উচিত ছিল মতবাদের সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষকে দেখিতে হইবে কংগ্রেস স্যোশ্যালিস্ট মতবাদের সহিত ফ্যাসিবিরোধী মতবাদের সংঘর্ষ হিসাবে, যেখানে আনুষ্ঠানিক গান্ধীবাদী বাবা ও মা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র।''[১০]

ভারতীয় ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে 'জাগরী' উপন্যাসে। একদিকে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী শক্তির দ্বারা সোভিয়েত আক্রান্ত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষণা করে। সোভিয়েতের প্রতি সংহতি ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখাই ছিল এই 'জনযুদ্ধ' নীতির উদ্দেশ্য। এই 'জনযুদ্ধ' নীতিকে অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো সতীনাথও মেনে নিতে পারেননি। সোভিয়েতের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও ''কংগ্রেস জনযুদ্ধ নীতিকে সমর্থন করতে পারেনি। স্যোশালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে যে কার্যত তারা ফ্যাসিস্ত শক্তির সমর্থকে পরিণত হয়।''[১১] তাহলে এটাই দাঁড়ালো বিলু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ায় 'জনযুদ্ধ' নীতির বিরোধী, নীলু কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষিত 'জনযুদ্ধ' নীতির সমর্থক, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায়। সতীনাথ ভাদুড়ী এখানে উল্টে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের অপগুণগুলি খুঁজে পেলেন কমিউনিস্ট চরিত্রের মধ্যে। নীলু গোঁয়ার, জেদী, একরোখা স্বভাবের, স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন—প্রভৃতি ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি খুবই কৌশলে নীলু চরিত্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিলু শান্ত স্বভাবের, সহনশীল মনোভাবের মানুষ। সে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট, দেশ জোড়া ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যে রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গোপাল হালদার লিখেছেন, ''মাইয়োপীয়া-পীড়িত অলডাস হাক্সলি যেমন আক্রোশের বশে তাঁর প্রায় উপন্যাসেই কোনো ব্যর্থ ও বিকলাঙ্গকে কমিউনিস্ট করেন, মনে হবে, এ ক্ষেত্রে

'জাগরী'র লেখকও তেমনি একটা মনোভাবের চোরাবালিতে আটকে গেছেন—অবশ্য দেশের অনেক লোকই আজ তেমনি অবস্থায়।"[১২]

এই উপন্যাসটিতে আমরা এক ধরনের রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা লক্ষ করি। মা গান্ধীবাদকে মেনে গান্ধীবাদী? তা তো নয়, মায়ের দুটি উপলব্ধি এখানে উদ্ধৃতিতে আলোকপাত করতে পারি। যেমন—

১. ''গান্ধীজি তুমি আমার এ কি করলে? তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছ,... তোমার দেখানো রাস্তায় স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল হয় না, বাপ ছেলেতে সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভায়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়।"[১৩]

২. তুমি স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্যি—কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাওনি।[১৪] অর্থাৎ রাজনীতি যদি আরোপিত হয় অঙ্গীকৃত না হয় তাহলে এরকম বিদ্রোহ তো স্বাভাবিক। অন্যদিকে দেখি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলে নীলু দাদার জন্যই থেকে গেছে। এখানেও একটা সূক্ষ্ম আধিপত্যকে আমরা লক্ষ করি। রাজনীতি পাল্টে নীলু যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে অংশ নিয়েছে তখন তার মধ্যে সংশয়, ভয়, দ্বন্দ্বকে আমরা লক্ষ করলাম। আজন্ম গোঁয়ার ছেলেটা 'দাদার পক্ষপুটে' থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রকে দেখেছে রুগ্ন-Jaundiced, 'সুবিধাবাদী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস মাত্র', সেই রাজনীতি ছেড়ে বিকল্প রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার কথাটা মুখ্যত সংকোচের কারণে দাদাকে বলতে পারেনি। আবার সে এই সংকোচ থেকে মুক্তি খুঁজেছে এই বলে যে—''জিজ্ঞাসাই বা করিব কেন? রাজনীতি ক্ষেত্রে নাবালকত্ব কি চিরকালই থাকিয়া যাইবে?[১৫] একদিকে যেমন আমরা রাজনৈতিক আধিপত্যকে লক্ষ করলাম ও প্রত্যাশিত বিদ্রোহকে দেখলাম তেমনি আর এক রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতাও নজরে পড়ল। যেমন বিলু রাজনীতি করে কিন্তু রাজনৈতিক সংঘাতকে পছন্দ করে না। সে বলেছে ''উপদলে উপদলে সংঘর্ষ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, প্রদেশে প্রদেশে সংঘর্ষ—প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। এ সবই রাজনীতি খেলার নিয়মের মধ্যে, নিষ্ঠুর নিষ্করুণ নিয়ম...।"[১৬] অথচ বিলুই বলছে—''রাজনৈতিক কর্মীর পথ বড় কঠিন, বড় বন্ধুর।"[১৭] বিলুর এরূপ স্ববিরোধিতার পাশাপাশি কমিউনিস্ট নীলু চরিত্রেও কিছু কিছু অসংগতি আমরা লক্ষ করি। নীলু যে রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও বিশ্বাস নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় সেই পার্টির ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় না। এক প্রকার দলের অমতেই দাদার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দেয়। পার্টির মতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এক পার্টিকর্মী। এও আর এক অসংগতি। নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, ''কিন্তু এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ে নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা কোনো কমিউনিস্ট সভ্যের পক্ষে সম্ভব কিনা; কমিউনিস্ট পার্টিতে কিভাবে

সমবেত আলোচনায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয়, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব থাকিয়া নীলুর প্রতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছেন।"[১৮]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তৎকালীন সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্যদের মার্কসবাদ বিষয়ে আগ্রহ উৎসাহ ছিল। তারা মার্কসচর্চা, বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি পালন ইত্যাদি করতো। বিলুও এক জায়গায় বলেছে, ''আমার যদি অনেক টাকা থাকিত, তাহা হইলে আজ উইল করিয়া যাইতাম। অনেক কোটি টাকা। তাহা দিয়া মার্কসবাদের প্রচারকার্য চলিত... কিন্তু টাকা আসিবে কোথা হইতে? যদি লটারির টিকিট না কিনিয়া লটারিতে টাকা পাইবার সুবিধা থাকিত।"[১৯] প্রসঙ্গটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি তৎকালীন যুগের কোনো—কমিউনিস্ট নেতৃত্বের দ্বিচারিতা লক্ষ করে এরকম মন্তব্য না করে থাকেন, তা হলে ভাগ্যের টাকায় বস্তুবাদের প্রচার অথবা টাকার অভাবে মার্কসবাদের প্রচার আটকে থাকা বিষয়টি তুলে ধরা মার্কসবাদ সম্পর্কে এক ধরনের অস্পষ্টতা।

প্রথম সংস্করণটির ভূমিকায় সতীনাথ ভাদুড়ী বলেছেন, কোনো রাজনৈতিক দল বা মতবাদকে আক্রমণ করা 'জাগরী'র উদ্দেশ্য নয়। সমালোচক নাজমা জেসমিন চৌধুরী লিখেছেন, ''এই নিরপেক্ষতা সতীনাথ ভাদুড়ী শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি।"[২০] একটি বিশেষ মতাদর্শ তাঁর জাগরীতে আক্রান্ত। অন্যদিকে আরও কিছু মত পাই। যেমন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—''রাজনীতির চেয়ে জীবন বড়ো, মতবাদের চেয়ে মানবতাবোধ বড়ো—পার্টির চেয়ে মানুষ বড়ো—এই উপলব্ধি 'জাগরী'তে আছে। কেবল গভীর জীবনানুরাগ নয়, সেই সঙ্গে লেখকের নিরপেক্ষতাও পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।"[২১] প্রতিটি চরিত্রকে লেখক স্বাধীন নির্মাণ দিতে চেয়েছেন, আপন বক্তব্য, আপন কর্মপদ্ধতিতে অস্থির থাকার সুযোগ দিয়েছেন বলে শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন। কিন্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি চরিত্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য কম। বিলু ও পিতা ছাড়া আর কেউই তেমনভাবে স্বতন্ত্র থাকেনি। মা তাই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, নীলু তাই একরোখা। আসলে সতীনাথ ভাদুড়ী সকল রাজনীতির মধ্যে এক সামঞ্জস্য খুঁজেছেন। তাঁর মতে, মার্কসবাদ ভালো কিন্তু মার্কসবাদের প্রয়োগকর্তারা ভালো নয়, যেমন নীলু। গান্ধীবাদ ভালো কিন্তু গান্ধীবাদের প্রয়োগকর্তারা অনুপোযুক্ত। যেমন কপিল দেও সিং, বচ্চন সিং, সহদেব সিং, লাডলীবাবু প্রমুখ। অর্থাৎ ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গান্ধীবাদ মার্কসবাদ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে। সতীনাথ টানটান উত্তেজনাময় কাহিনি পটে এইভাবেই সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেছেন। কাহিনির মধ্যে নীলুর দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার ঘটনাটাই মুখ্য। সেই ঘটনা সূত্রে যাবতীয় রাজনৈতিক দুর্ভোগ ভোগ করেছে গোটা পরিবার। আবার দাদার ফাঁসি না হবার খবরে নীলুর

ধমনীতে স্পন্দন আরম্ভ হয়েছে, পৃথিবীকে লাস্যময়ী ছন্দে লীলায়িত বলে মনে হয়েছে। আগাগোড়া চরিত্রগুলিতে রাজনৈতিক সংঘাত দুর্ভোগ আছে কিন্তু রাজনৈতিক সমাপন নাই। সতীনাথ ভাদুড়ী ভারতীয় চিরায়ত সংস্কৃতিকে আধার করতে চেয়েছেন আর যূথবদ্ধতা, সৌভ্রাতৃত্বকে করেছেন আধেয়। রাজনীতি হল আকস্মিক ঝটিকা মাত্র। এই ঝটিকা থেকে আধার দিয়ে আধেয়কে আগলে রেখেছেন। তাই মার্কস, রাশিয়া এই সংস্কৃতিতে উহ্যভাবে সহানুভূতি বর্ষিত হলেও প্রকটিত হয়েছে চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতি। গান্ধীবাদী পিতার মুখ দিয়ে সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। ''নিজের বেদ পুরাণ, মুনি ঋষি ইতিহাস সব গেল—সকলের নজর রুশের উপর। আরে, রুশ কি নিজের দেশের চাইতেও উঁচুতে? দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কথা আমরাও পড়িয়াছিলাম। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, ওয়াশিংটন, কোসুথের অমর কাহিনী আমাদেরও রোমাঞ্চ আনিয়া দিত।... কিন্তু তাই বলিয়া শিবাজীর গৌরবকথা ভুলিয়া যাই নাই। বিবেকানন্দের বুলি ছাড়িয়া মার্ক্সের বুলির ফাঁদে পড়ি নাই। মহাত্মাজী অপেক্ষা স্ট্যালিন কে বড় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।''[২২] সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতিই এই উপন্যাসের মুখ্য স্বর।

উল্লেখপঞ্জি

১. মণ্ডল, কল্যাণ, 'সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনকথা', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ১৮১

২. সঙ্গোপাধ্যায়, সুবল স.), 'ভাদুড়ীজী', ফনীশ্বর নাথ, 'রেণু', 'সতীনাথ স্মরণে', ভারতী ভবন, পাটনা, ১৯৭২, পৃ. ৩৬

৩. ভট্টাচার্য, ড. বীরেন, 'সকল কাজের সেরা', গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল (স.) 'সতীনাথ স্মরণে', ভারতী ভবন, পাটনা, ১৯৭২, পৃ. ৬২

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল (স.), 'স্মরণাঞ্জলি' জয়প্রকাশ নারায়ণ, সতীনাথ স্মরণে, ভারতী ভবন, পাটনা, ১৯৭২, পৃ. ১৫

৫. হালদার, গোপাল, 'স্মৃতির পটে', *দিবারাত্রির কাব্য*, সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, আফিফ ফুয়াদ (স.), কলকাতা, পৃ. ৯৩

৬. সরকার, পিনাকেশ, 'সম্পর্ক ও নিঃসম্পর্কতার আখ্যান; 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৮৬

৭. ভাদুড়ী, সতীনাথ, *জাগরী*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৪৬

৮. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'সতীনাথের জাগরী', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৩২

৯. তদেব, পৃ. ৩৪

১০. সতীনাথ ভাদুড়ী প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা, ২নং আলোচনা নীরেন্দ্রনাথ রায়; সতীনাথ রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৮

১১. দাশ, সুস্নাত, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৯৯
১২. সতীনাথ ভাদুড়ী প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা, ৩নং আলোচনা; গোপাল হালদার; সতীনাথ রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ১৩
১৩. ভাদুড়ী, সতীনাথ, *জাগরী*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪০৫ ব., পৃ. ১২৪
১৪. তদেব, পৃ. ১২৪
১৫. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৬. *সতীনাথ রচনাবলী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৩৬
১৭. তদেব
১৮. সতীনাথ ভাদুড়ী প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা, ২নং আলোচনা নীরেন্দ্রনাথ রায়; সতীনাথ রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৯
১৯. *সতীনাথ রচনাবলী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৪১
২০. চৌধুরী, জেসমিন নাজমা, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৯৬
২১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের প্রতিমা*, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৩১
২২. *সতীনাথ রচনাবলী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

- **চিহ্ন (১৯৪৭)**
- **স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১)**

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯মে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রামে। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা নীরদাদেবী। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সেটেলমেন্ট দপ্তরের আধিকারিক পদে আসীন ছিলেন। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্থানে মানিকের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। ১৯২৬-এ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাঁকুড়া মিশন কলেজ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি. পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্র পড়ার জন্য ভর্তি হন। ''এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামি' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম মানিক (পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্যবহারে কাহিনি নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।''[১]

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'জননী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'জীবনের জটিলতা'। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামি' প্রকাশের পর ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'। ওই বছরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের পদে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুর নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ওই বছরের জুলাই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও 'মোটা ও মিহি কাহিনী' নামক একটি গল্পগ্রন্থ। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং পারিবারিক সহায়তায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড

পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রশনালয় স্থাপন করেন। এই সময়পর্বেই 'পরিচয়' পত্রিকায় 'অহিংসা' এবং শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'সহরতলী', নিজস্ব প্রকাশনায় পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অর্গানাইজার-এর বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করেন। এই বছরই 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। এই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্প গ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'। চিন্মোহন সেহানবিশ লিখছেন, ''আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম মানিকবাবুর গল্প পড়ে। এমন সময়ে আমাদের ঔৎসুক্যে ইন্ধন যোগাবার জন্যই যেন প্রকাশিত হল মানিকবাবুর আর একটি উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'। এতে তিনি কয়েকটি কমিউনিস্ট চরিত্রের অবতারণা করেন। আমাদের (ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ) সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল এ গল্পের ছত্রে ছত্রে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী' লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। এর কিছু দিনের মধ্যে একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম 'প্রতিবিম্ব' সম্পর্কে আমাদের মতামত। ...মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে; 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চান 'ত? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমত চিনব, দেখবেন তখন গল্প ঠিকমত উতরোয় কি উতরোয় না।''[২]

এই ঠিকমত 'চেনা'-র তাগিদ থেকেই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে ও তারপর ১৯৪৪-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও সভ্যপদ অর্জন করেন। স্পষ্টতই সাহিত্য ক্ষেত্রেও ওই কমিটমেন্ট-এর ছাপ চলে এল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সমালোচক অলোক রায় 'মানিক সাহিত্যের জলবিভাজন রেখা'[৩] দেখতে পান। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান মানিকের হঠাৎ কোনো ঘটনা নয়। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের প্রতি টান অনুভব তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া কালেই অনুভব করতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে ধরা পড়তো পিছিয়ে থাকা মানুষের জীবনের যন্ত্রণা। লেকের পাশ দিয়ে ঘর ফেরতা মানিকের অনুভূতিতে নাড়া দিতো অনেক অনেক ঘটনা। তিনি লিখছেন, ''লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিতো, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মতো, কোন দিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষাভূষো ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।''[৪]

লেখকজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসীয় মতবাদের মধ্যেই খুঁজেছেন ওই আর্তচিৎকারের অর্থময় দিকগুলিকে। মার্কসীয় মানিক হয়ে ওঠার আগে—''তিনি যৌন বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়েছেন—শেখার জন্য তো বটেই তাছাড়া নিজের মনের ধারণাগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য, তেমনি পরবর্তী কালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার সময় থেকে মার্কসীয় নীতি দর্শন সংক্রান্ত যা বই পাওয়া যেত তিনি তা কিনতেন ও পড়তেন।''[৪] আর ওই অনুশীলনই তাঁর চৈতন্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাঁর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জীবন সম্পর্কে নানান জটিল জিজ্ঞাসা তার সমাধান সূত্রের অনুসন্ধান করেছেন মার্কসবাদের মধ্যে। তাই তিনি লিখছেন, ''মার্কসবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হল ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাত, সমাজজীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।''[৬]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন তখন সময়টাও অগ্নিগর্ভ। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্বে বাংলাজুড়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, জাপানি বোমারু বিমানের চোখরাঙানি—এই সময়পর্বে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় বামপন্থীদের সদর্থক ভূমিকা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আকৃষ্ট করেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, ''তারপর এল মহাযুদ্ধ। দেখা দিল মন্বন্তর। মুহূর্তে অনেক মিথ্যার আবরণ সরে গেল। হিংস্র লোভের কল্পনাতীত প্রতিযোগিতায় বেরিয়ে এল এই সমাজে—এই রাজনীতি—এই জীবনচর্যার আসল চেহারা। আর্কিমিডিসের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চকিতে নিজের অঘোষিত সত্যের সন্ধান পেয়ে বলে উঠলেন—পেয়েছি এইবার পেয়েছি।''[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'চিন্তামণি' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬) দিয়ে। এরপর প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭), 'খতিয়ান' (১৯৪৭), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'পেশা' (১৯৫০), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১-৫২), 'ছন্দপতন' (১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), 'পাশাপাশি' (১৯৫২), 'সর্বজনীন' (১৯৫২)। একদিকে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ অন্যদিকে সাংসারিক প্রয়োজনে প্রচুর লেখালেখির তাগিদ— এপিলেপ্সি আক্রান্ত মানিক সাংসারিক দারিদ্র্য সত্ত্বেও মতাদর্শের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। পার্টির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে। ধনঞ্জয় দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনাও রয়েছে। ''১৯৪৮ সালে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অতিবামপন্থী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল তার প্রতিবাদে নাকি তিনি (মানিক) পার্টি থেকে সরে যান।... তাঁর মৃত্যুর (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬) পর স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত... কেন্দ্রীয় কমিটির

শোকপ্রস্তাবে তো স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে ১৯৪৪ থেকে আমৃত্যু তিনি পার্টিসদস্য ছিলেন।"[৮]

নাজমা জেসমিন চৌধুরী তারাশঙ্কর ও মানিকের তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছেন—"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা তারাশঙ্করের বিপরীত পথ ধরে। তারাশঙ্করের মত তিনি সাহিত্যিক হবার আগে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। সাহিত্যিক সবার পরেই মানিক রাজনীতিতে যোগদান করেন।"[৯]

সাহিত্যিক হয়ে রাজনীতিতে আসার কারণে জীবন সম্পর্কেও সম্যক উপলব্ধি ঘটেছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মা নদীর মাঝি'। দুটি উপন্যাসেই বাহ্যিক অর্থে রাজনীতি নেই। তাই রাজনৈতিক নায়কও অনুপস্থিত। কিন্তু কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় ওগুলিতে আছে যা পরবর্তীকালে মার্কসীয় মানিক নির্মাণে সহায়তা করেছে। ১. বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি, যা শশী ডাক্তারের মাধ্যমে পুতুল নাচের ইতিকথায় প্রতিষ্ঠিত। বলা যায় লেখকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বহন করেছে শশী ডাক্তার। পরবর্তীকালে ওই 'অদৃশ্যশক্তি'কে মানিক চিহ্নিত করেছেন 'অর্থনৈতিক শক্তি' রূপে। ২. এই অদৃশ্য শক্তির হাতে নিপীড়িত জনতার ভাগ্যকে মানিক ছেড়ে দেননি। তার দুর্দশার জন্য যেমন মানুষই দায়ী, মানুষই ঘটাবে সেই দুর্দশামুক্তি; বাংলা উপন্যাসে যা একেবারেই ভিন্নধর্মী কণ্ঠস্বর। ৩. অন্তজ—খেটেখাওয়া মানুষ নায়ক হিসেবে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত জায়গা ছাড়িয়ে। ধনঞ্জয়, মালা, কুবেররা ভাষা পেয়েছে, কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পেরেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও নিয়তির হাতের ক্রীড়নক মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিকে পদ্মানদীর খেয়াল খুশি অন্যদিকে আড়তদার, মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ। কুবের-গণেশ-রাসু-আমিনুদ্দিরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে শোষণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চায়। সঙ্গত কারণেই সমালোচক লেখেন—" 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' সবখানেই গণমানুষের স্ব-শব্দ পদচারণা।"[১০]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৪০-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই উপন্যাসটিতে জীবনের শরীরী সংবেদনার সঙ্গে 'শ্রেণি' বোধের বিষয়টি দানা বেঁধেছে। বিধবা, পুত্রহারা, বিশালকায়া যশোদা ও তার বাড়ি শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসেছে। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশাকে অনুভব করেছে। যশোদা ঠিক সেভাবে শ্রমিক রাজনীতি বোঝে না। তবুও শ্রমিকদের সভায় সে গেছে, খুব একটা খারাপ বা ভালো লাগেনি। সেখানেও সে রাজনৈতিক কূটচালাকিকে লক্ষ করেছে। যশোদা, কুলিমজুর ও অন্যান্য শ্রমিকদের একটা শ্রেণি হিসেবে দেখতে চেয়েছে। এই যশোদাকেও শ্রমিকরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেছে এবং তার কথা মতোই সত্যপ্রিয়র

দুটি মিলে ধর্মঘট করতে এগিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে গেছেন তা বোঝা যাচ্ছে, তারই পূর্বাভাষ ছটা লক্ষ করা গেছে 'সহরতলী' উপন্যাসে। ''অস্পষ্টভাবে হলেও মানিক 'সহরতলী'-তে শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনা ও সেই শক্তির শত্রুকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা তার শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির পূর্বসূরী।''[১১]

অবহেলিত মানুষ যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভাষা চাইছে তিনিও যখন মনে করতে শুরু করেছেন, শোষণমুক্তিই মানবমুক্তির অন্যতম পথ, ওইসব অবহেলিত মানুষজনের একজন হতে হবে, সেই পর্বের উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'। আগেই উল্লেখ করেছি এই উপন্যাসটিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির নায়ক তারক। মধ্যবিত্ত, ভাবপ্রবণ, স্বপ্নে শ্রমিকজাগরণ প্রত্যাশী। পার্টি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে অক্ষম। অনেক বাধ্যবাধকতায় পার্টিতে অবস্থিতি। গ্রামের ছেলে কলকাতায় এসে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি দেখে হতাশ। সবই অর্থহীন ঠেকে তারকের। গ্রামে ফিরে আসে, গ্রামকে ভাল করে চিনব বলে। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষকে জানব বলে। এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কমিউনিস্ট চরিত্র সন্ধান করেছেন তাতে থেকে গেছে অনেক অস্পষ্টতা, যা স্বাভাবিক। পরে তা চিন্মোহন সেহানবিশের কাছে স্বীকার করেছেন যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মধ্যবিত্তের স্বার্থসংকীর্ণতা বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে থেকেই সচেতন ছিলেন. আরও সচেতন হয়েছেন মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পর। মার্কসবাদকে অনুশীলনে রূপান্তরিত করার পর মানিকের উত্তর পর্বের রচনায় 'প্রতিবিম্ব'-এর অস্পষ্টতা অনেকখানি কেটেছে। গোত্রান্তরিত হওয়ার আগে মানিকের ছোটোগল্পে ফ্রয়েড এসেছে। লিবিডোর জটিল জালে গল্প উপন্যাসের নায়কনায়িকা মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু মার্কসবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত হবার পর, পার্টির কর্মসূচি রূপায়ণ করার পর্বে যে গল্প উপন্যাসগুলি তিনি লিখেছেন, সেখানে লেখকের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দুর্ভিক্ষ, জমির আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, দেশবিভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়ভিত্তি হিসেবে এসেছে। এই পর্বের 'চিহ্ন' ও 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস দুটির বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করব এবং তারই পাশাপাশি আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পকে আমাদের আলোচনার সূত্রে উপস্থাপন করব।

তেভাগা আন্দোলন ও কৃষক সংগ্রামকে প্রেক্ষাপট করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ অঞ্চল এবং 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পটির প্রেক্ষাপট বড়াকমলাপুর। 'হারানের নাতজামাই' গল্পটির নায়ক কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডল পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য, বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামী নায়ককে সালিগঞ্জ থেকে কিছুতেই পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। বাধা দেবে সংগ্রামী জনতা। 'দস্তখতী পরোয়ানা' নিয়ে রেইডিং পার্টির অফিসার মন্মথ হাসখালি পাড়ায় তল্লাশি করবে। এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় আসন্ন ঠিক তখনই ভুবনকে বাঁচাতে ময়নার মা যে কৌশল অবলম্বন করেছে তা অবিশ্বাস্য সত্য। নিজের বাড়িতে মেয়ের পাশে শুইয়ে, জামাই পরিচয় দিয়ে ময়নার মা বাঁচিয়েছে ভুবন মণ্ডলকে। ময়নার মায়ের কথাতে স্পষ্ট হয়েছে গণনায়কের প্রকৃত রূপ—''মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিচ্ছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে।''[১২]

''হারানের নাতজামাই'' গল্পে যেমন গণআন্দোলনের চেতনা, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পে তেমনি গণআন্দোলনের গোপন প্রস্তুতির ছবি।''[১৩] 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পটির মধ্যেও রয়েছে প্রত্যক্ষ রাজনীতি। হাওড়ার ঘনশ্যাম বেটনট কারখানার শ্রমিক দিবাকর পুলিশি প্রহরা এড়িয়ে স্ত্রী আন্নাকে নিয়ে গগনের গরুর গাড়িতে করে ছোটবকুলপুরের সংগ্রামী কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে গেছে, পৌঁছে দিতে গেছে তাদের সংগ্রামের প্রেরণাস্বরূপ একটি গোপন ইস্তাহার—'ছোটবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থাকলেও গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এখানে দিবাকরের সঙ্গে মিশে গেছে রাজনৈতিক কর্মী মানিক স্বয়ং। আর সে কথাই প্রকাশ পেয়েছে জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখায়—''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছোটবকুলপুরের যাত্রী। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্র আজও অন্ধ রাত্রির অবরোধে ঘেরা। প্রকৃতপক্ষে এখনো ভোর হয়েছে বলা যায় না—তবে তাঁর সাহিত্যের নতুন দিগন্তে আরেক সূর্যোদয়ের লগ্ন প্রত্যাসন্ন।''[১৪] তাঁর রাজনৈতিক অনুশীলনই তাঁর রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। যা দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন তাকে বাস্তবিক প্রয়োগের দায়বদ্ধতার স্বল্পতম পরিসরে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন আবার সাহিত্যিক দায়বদ্ধতাকেও কখনও ছোটো করে দেখেননি। সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন, ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সেই কথাশিল্পী যিনি শিল্পপ্রতিভা ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেলাতে পেরেছিলেন এক দেহে।''[১৫]

তাঁর 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'পরিস্থিতি' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যস্তরের 'মন্বন্তর', 'বস্ত্রসংকট' যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি। 'সাত সের চাল' প্রাণের গুদাম ইত্যাদি গল্পে আছে দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ছবি। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নারীর সম্ভ্রম

কিভাবে বিপন্ন হয় সেই ছবিও ফুটে উঠেছ 'নেড়ি', 'অমানুষিক' প্রভৃতি গল্পে। বস্ত্রসংকটের ছবি ফুটে উঠেছে 'দুঃশাসনীয়' গল্পে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, বোমাতঙ্ক, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি বিষয় দানা বেঁধেছে 'প্যানিক' গল্পে। কালোবাজারি আড়তদারি ইত্যাদির কবলে পড়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন 'অসহযোগী' গল্পের রমেন তার বাবার আড়ৎকে খুলে দিয়ে না খেতে পাওয়া মানুষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে।

'কালোবাজারি', 'ফাটকাবাজি' আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্বের কতকগুলি কুলক্ষণ কিভাবে আমজনতার জীবনকে জটিল করে তুলেছিল সেই বিষয়টি উঠে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিটেমাটি' (১৯৪৬) নাটকে।

অর্থাৎ উত্তরকালের উপন্যাস ছোটোগল্পে নাটকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসীয় মতাদর্শের সরাসরি প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। বিগত চুয়াল্লিশ পর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত তো ছিলই।

মানিকের মার্কসীয় মতাদর্শের নিরিখে এখন আমরা 'চিহ্ন' ও 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস দুটি আলোচনা করবো।

■ চিহ্ন

১৯৪৫-এ শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফ্যাসিবাদের পরাজয় এই বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ১৯৪৫-এর ২ মে সোভিয়েত সেনা বার্লিন দখল করে এবং রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়। সোভিয়েতের বিজয় উপলক্ষে কমিউনিস্টরা কলকাতার রাজপথে মিছিল সংগঠিত করে। এরই মধ্যে আমেরিকা জাপানকে আয়ত্তে আনতে হিরোসিমা, নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণ করে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। কুড়ি হাজার আজাদ হিন্দ (INA) সেনা বন্দি হয়। তাদের বিচার শুরু হলে কলকাতায় ছাত্রযুবরা বিচারের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পনের হাজার ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে অংশ নেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫-এ এই তিনদিন তা চরম আকার নেয়। ছাত্র, শ্রমিক বনাম মিলিটারি। মিলিটারির গুলিতে ৩৩ জন নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হন। শহিদ হন রামেশ্বর ব্যানার্জি ও শ্রমিক আব্দুল সালাম। ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর এই তিনদিনের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কলকাতা তিনমাস পরে অর্থাৎ ১৯৪৬-এর ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি দেখল আরও এক উত্তাল সংগ্রাম। ক্যাপ্টেন রসিদ আলিকে ইংরেজ সরকার সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ছাত্র আন্দোলন গর্জে ওঠে। ১৯৪৫-এর ২১-২৩ নভেম্বরের ঘটনাকে স্মরণ করে অমলেন্দু সেনগুপ্ত লিখছেন, ''১৯৪৬-এ ১১-১৫

ফেব্রুয়ারি কলকাতার চেহারা অবিকল তাই। রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সামিল এবং তাদের আকাশফাটা স্লোগান। কলুটোলা কলাবাগান, পটোয়ার বাগান, ইলিয়ট রোড, গর্চা, রামবাগান, মোহনবাগান, নাকরেল ডাঙ্গা, কাঁকুড়গাছি গ্যাস স্ট্রিট—যাবতীয় বস্তি উজাড় করে সব মানুষ রাস্তায়,... হ্যাঁ তারা লড়ছে। মর্গে মর্গে তাদের লাশ। অজানা অনামা শহীদদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।"[১৬]

সেদিন আন্দোলন সংগ্রামের রাশ ছিল ছাত্রদেরই হাতে। ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মেহনতি মানুষের একটা বড় অংশ। ১১ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল মুসলিম ছাত্র লিগ আর তাকে সমর্থন জানিয়েছিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। সর্বাত্মক হয়েছিল ধর্মঘট। তৎকালীন ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—''পুলিশের আক্রমণ শুরু হলো। প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালো ট্রাম বাস রিক্সা শ্রমিকরা। এক ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল কলকাতার সমস্ত যানবাহন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুবক, বস্তিবাসী নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান জনতা সামিল হল প্রতিরোধ সংগ্রামে গড়ে তুলল পথে পথে ব্যারিকেড। মুখে তাদের রণধ্বনি 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো' আর 'হিন্দু মুসলমান এক হও'।"[১৭] ছাত্রদের এই উন্মাদনা ছিল এক অর্থে ঐতিহাসিক। তৎকালীন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দোহা ছাত্রদের হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, যদি তারা ফিরে না যায় তাহলে সব চুরমার করে দেবে। সংগ্রামরত ছাত্রদের পক্ষে ছাত্র ফেডারেশন-এর তৎকালীন সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য উত্তরে জানিয়েছিলেন—''ইউ ক্যান বিট্ আস্, ইউ ক্যান শুট আস, বাট ইউ ক্যান নট স্ম্যাস্ আস।"[১৮]

আমরা উপরের আলোচনা থেকে ছাত্র-আন্দোলনের দুটি ঐতিহাসিক পর্বকে পাচ্ছি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটা দুটি পর্যায়—এক, ২১-২৩ নভেম্বর ১৯৪৫, ১১-১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ঘটনাকে তাঁর 'চিহ্ন' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত মনে করেন, ১৯৪৬-এর ঐ অগ্নিগর্ভ নভেম্বরের দিনগুলিই 'চিহ্ন' উপন্যাসের পটভূমি।[১৯] গৌতম চট্টোপাধ্যায় এই মতের সমর্থক।[২০] আবার অনেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের রসিদ আলি দিবসটিকে ইঙ্গিত করেছেন। এঁদের মধ্যে পাথপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-রা উক্ত মতের অর্থাৎ রসিদ আলি দিবসের সমর্থক।[২১] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—''নভেম্বরের ঘটনাকে ছাপিয়ে গোটা দেশে দুন্দুভি বেজে উঠল '৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত চারদিন আবার কলকাতা শহর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে রেখেছিল। এবার উপলক্ষ হল আজাদ হিন্দ্ ফৌজেরই আব্দুর রশীদ আলির মুক্তি—ইংরেজ চেয়েছিল যাতে হিন্দুরা দাবিতে

যোগ না দেয়। কিন্তু কে রোধ করবে সেদিনের জলতরঙ্গ? বাংলার মুসলিম লীগপন্থী 'প্রধানমন্ত্রী' হুসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি স্বয়ং বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিলেন কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারি শুধু সেদিনের উন্মাদনার চেহারা আঁকতে—তবে পাঠককে বলব, সংগ্রহ করে পড়ুন মানিকবাবুর লেখা 'চিহ্ন'...।"[২২]

এইসব বিতর্ক থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো ঐতিহাসিকের মতো দিনলিপির অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেননি। তিনি কথাকাহিনির লেখক। একটা সময়ের নির্দিষ্ট একটা ঘটনা নয়, বা নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নয়, একটা চলমান সময়ের চিহ্নকে ধরার চেষ্টা করেছেন। ''মানিক এই তিনমাসের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া উভয় ছাত্র আন্দোলনের মেজাজকেই প্রত্যক্ষ করেছেন চড়া সুরে। ছাত্রদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল, তার ব্যাপকতাও প্রত্যক্ষ করেছেন সমান তালে।"[২৩] তারই প্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিহ্ন' উপন্যাসটিকে লিখেছেন। লেখক নিজে ভূমিকা অংশে লিখেছেন—''দ্রুত বহমান ঘটনা, সমকালীন কলকাতার অস্থির রাজনৈতিক ঘূর্ণি, পুলিশ ছাত্র-সংঘর্ষ, গুলি বর্ষণে ছাত্রের মৃত্যু ইত্যাদি সংবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজনিত বিবরণ 'চিহ্ন' উপন্যাসটিকে একটি তথ্য-কাহিনির গুরুত্ব দিয়েছে।"[২৪]

এই 'চিহ্ন' উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে এক চলমানতাকে আমরা লক্ষ করি। পুলিশ যখন আন্দোলনরত ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি বর্ষণ করছে তখন গ্রাম থেকে শহরে কাজ করতে আসা গণেশ কর্মসূত্রে বাইরে বেরিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। গণেশের বাবা যাদব। গ্রামের ভাগচাষিরা যখন তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের উদ্দেশে জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন সে তাদের সঙ্গ নেয়নি। ব্যারাকের লোকেরা যখন তার যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায় তখন রুখে দাঁড়ায় গ্রামের সংগ্রামী জনতা। ব্যারাক থেকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে আসে রানিকে। তখন যাবদ উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-এর প্রয়োজনীয়তা। যাদব সিদ্ধান্ত নিয়েছে—''সে ফিরে আসবে, বউ ছেলে মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।" যাদব গণেশের সন্ধানে কলকাতা আসলে সে কলকাতায় দেখেছে অন্য আর এক বিপ্লব। লেখক গ্রামীণ আন্দোলনের প্রত্যক্ষতাকে নগর কলকাতার সংগ্রামী মেজাজের সঙ্গে এক করে মিলিয়েছেন। মালিনী ভট্টাচার্য লিখেছেন—ইতিহাসের এই অলক্ষ্য দ্রুত তালকে লেখক ধরার চেষ্টা করেছেন, মিছিলটাকে freeze করে দিয়ে এবং একই সময়ে মিছিলের বিভিন্ন মুখগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে ববির্তিত করে।"[২৫] 'চিহ্ন' উপন্যাসের কাহিনির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লিখবার সময় আমাদের আলোচনায় এসেছে ছাত্রদের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সাধারণ বস্তিবাসী মানুষ ট্রাম শ্রমিক, ট্রাক

শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক সহ অন্যান্য মধ্যবিত্ত অফিসযাত্রী মানুষও অংশ নিয়েছিল। হেমন্ত, সিতা, রসুলদের মত ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা যেমন এগিয়ে এসেছে ওসমানের মত বস্তিবাসী শ্রমিক, তাদের সঙ্গে অংশ নিয়েছে অজয়ের মত অফিস কর্মীও। সবাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবিচল। সবাই এগিয়ে যেতে চায়, পিছুটান কি তারা জানে না।

ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা অধ্যয়ন হতে পারে না। রাজনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা ছাত্রসমাজের কাজ না। এই সংবেদনশীল অংশকে দেশের দুর্দিনে আটকে রাখা যায় না—এই বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা গেছে সিতা চরিত্রের মধ্যে। হেমন্তর পড়াশুনা কেন্দ্রিক জীবনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটলে মা অনুরূপা যখন সিতাকে দায়ী করেছে তখন সীতার জবাব—''...সব কিছুর মধ্যে এদেশে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে তালাবন্ধ করে রাখা দরকার? শত শত আঘাত এসে তাকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কি করে?''[২৬] দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, শোষণমুক্তির সংগ্রামের সংগ্রামী অভিঘাত সংবেদনশীল অংশের চেতনায় আঘাত হানে, সেই চেতনা শানিত হয় মনোজগতের মতাদর্শে। আর তাই 'চিহ্ন' উপন্যাসে সেই সংগ্রামী জনতার জাগ্রত চেতনাই উদ্ভাসিত। ''সত্যসন্ধ লেখকমাত্রেই একথা বোঝেন যে, জীবন শিল্পের থেকে বড় বলেই শিল্প কখন জীবনের কোলছাড়া হতে পারে না। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই।''[২৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষত গোত্রান্তরিত মানিকের কাছে জীবন মানে রাজনীতি বিযুক্ত জীবন নয়, 'চিহ্ন' উপন্যাসেও মানিক খুঁজেছেন, সংঘবদ্ধ জীবনকে। সংগ্রামী সত্তাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে লিখেছেন—''বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। এই ধরনের কাহিনি, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।''[২৮]

ছাত্র-জনতা পুলিশের সংঘর্ষে গণেশ গুলি খেয়ে আহত। পরে হাসপাতালে মারা যায়। আহত থাকা অবস্থায় সে তার নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে মেলাতে চেয়েছে সংগ্রামী উত্তেজনাকে। ''বিশ বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেনি, মনেও ভাবেনি। এত বিরাট এমন মারাত্মক ঘটনা এত মানুষকে নিয়ে।''[২৯] 'এমন মারাত্মক ঘটনা', 'এত মানুষ' এবং তাদের অল্পসময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়ন—এটাই নতুন টেকনিক। চলমান সময়ের 'চিহ্ন'—তার মধ্যে বিশেষ একটি দিনের উত্তাল তরঙ্গ। সেই দিনটি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। আগেই আমরা আলোচনা করেছি ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তির দাবির একটি নির্দিষ্ট দিন। ছাত্ররা ধর্মঘট ডেকেছে, সমাজের অধিকাংশ স্তরের মানুষ তাকে সংহতি জানাতে এগিয়ে এসেছে। বিশেষত

শ্রমিক কর্মচারী মেহনতি মানুষ। সেই সংগ্রামরত মানুষের উপর পুলিশের গুলি লাঠি বর্ষণ—এটাই কেন্দ্রীয় বিষয় আর এই বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে কয়েকটি চরিত্র। সব চরিত্রই প্রথমাবস্থায় রাজনৈতিক থাকেনি কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনা আর অনেকদিনের পুঞ্জিভূত বেদনায় কম্পমান মানুষ আবেগাপ্লুতভাবেই হয়ে উঠে ছে রাজনীতিক।

গণেশের অনুভূতিতে আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সে দেখেছে সেদিনের কলকাতার রাজপথে এক ধরনের গণ্ডগোল। সে ভেবেছে—''এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না।... কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।''[৩০] ধর্মগুরুর উন্মত্ত কোনো ভাষণ নয়, অথবা সাময়িক কোনো জাতিগত উন্মাদনা নয়, এ এক বিপ্লবী মতাদর্শের নিদর্শন যার বলে বলিয়ান মানুষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানে অনড়। তাই সঙ্গত কারণেই অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছে—''গতকাল ও আজ কলকাতার রাজপথে আমরা যা দেখলাম, তারই নাম গণঅভ্যুত্থান।''[৩১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী সময় পর্বের এই গণঅভ্যুত্থানে আপামর মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল তা নানাভাবে 'চিহ্ন' উপন্যাসে উঠে এসেছে। এই ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করেছে কয়েক জন, তারাও তাদের ব্যক্তিজীবন সত্তাকে ত্যাগ করে সর্বাঙ্গিন মানবিক সমষ্টিগত সত্তায় লীন, যেমন সীতা, হেমন্ত, রসুল, গণেশ, যাদব, অজয়, ওসমান প্রমুখ।

এই রাজনৈতিক উত্তেজনাকর প্রায় অভ্যুত্থানের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মনোভাব বিচার করা জরুরি। (১) তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মনে করেছিলেন, কলকাতার রাজপথে যা চলছে তা স্বাভাবিক রাজনীতির লক্ষণ নয়। তিনি এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন—''কলকাতার রাজপথে এখন গুণ্ডারাজ চলছে, আমরা তার নিন্দা করছি।[৩২] (২) জাতীয়তাবাদী বামপন্থী দলও প্রায় একই মনোভাব জ্ঞাপন করে তারাও তাদের বিবৃতিতে জানায়—''গত দুদিনের ঘটনা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গুণ্ডারা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরা এখন শহরে নেতৃত্ব করছে। এ আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।''[৩৩] তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিও এই আন্দোলনের প্রকৃতি ও পরিধি দেখে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইতে নিজেদের প্রস্তুত হতে বলেছিল ঠিকই কিন্তু—''১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার রক্তে ধোয়া রাস্তায় দাঁড়িয়েও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা অশান্ত মানুষের প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করতে অসমর্থ।''[৩৪]

এই আন্দোলনের তীব্রতা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সবাই উপলব্ধি করতে পারেনি। দলের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়। ''বাংলা, অন্ধ্র, বিহার বা বোম্বাই-এর স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বই শুধু তখন গণআন্দোলনের প্রয়োজন বুঝেছিলেন, পি.সি. যোশীর

নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখনও ছিল দোলাচলচিত্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।"[৩৫]

নেতৃত্বমুখিনতা থেকে সরে এসে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ ওই বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বামপন্থীদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাদের দুই ব্যারিকেড ভাঙার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছিল—প্রথমে আপন দল বা নেতৃত্ব পরে পুলিশের। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন তৎকালীন রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব ভবানী সেন 'চিহ্ন' উপন্যাসটির প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু তার সঙ্গে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছিল তার কণ্ঠে—''মানিকবাবুর দৃষ্টি এখনও সীমাবদ্ধ, এখনও সাহস করে সত্য উদ্‌ঘাটনের পথে বেশিদূর পা বাড়াতে পারেননি।"[৩৬] কিন্তু যে সত্যটা তখন সামনে এসেছিল তা হল—''নেতাদের ডাক আসার জন্য শ্রমিকরা অপেক্ষা করেননি। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশে স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটের পর উর্দিপরা ট্রাম শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দলে দলে মিছিল করে গেল।"[৩৭]

কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সহ শহরতলির সর্বত্র মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা' পত্রিকা তার সম্পাদকীয় মারফৎ দাবি করে—''মিলিটারির এই অত্যাচারের অবসান ঘটাইতে হইবে, যাহারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাহাদের প্রকাশ্যে বিচার করিয়া শাস্তি দিতে হইবে, মৃত শহীদের পরিবার পরিজনকে খেসারৎ দিতে হইবে, ১৪৪ ধারা এবং অন্যান্য সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে। শান্তিপূর্ণ সংগঠিত ও সুপরিচালিত সর্বব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল গভর্নমেন্টকে কেবল উপরোক্ত দাবি পূরণে বাধ্য করিবে না, ক্যাপ্টেন রসিদ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি দুর্ব্বার করিয়া তুলিবে।"[৩৮]

'চিহ্ন' উপন্যাসে গণেশ বুলেটের যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় অস্ফুটস্বরে বলে গেছে—'ওরা এগোবে না'?—এই জিজ্ঞাসা বারবার উপন্যাসে ধ্রুব পদের মতো ঘুরে ফিরে এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সংশয়ী রাজনীতিতে ওই একটি বাক্যের বারবার প্রয়োগের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। এর উত্তরও আমরা উপন্যাসের শেষ অংশে পেয়েছি—''আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি, আমরা এগিয়েছি।"[৩৯] অর্থাৎ কোনো দলীয় নির্দেশের ঘেরাটোপ অথবা তৎকালীন ইংরেজের মিলিটারির বুলেট কেউই ঠেকাতে পারেনি।

এ এক স্বাভাবিক অভ্যুত্থানের ছবি। মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা বলা যায়, পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত রূপান্তর। কখন জনঅংশ ফুঁসে ওঠে তা উপযুক্ত সময়ে বুঝতে হবে নেতৃত্বদানকারী বিপ্লবী অংশকে না হলে বিপ্লবী জনঅংশের ক্ষোভকে ইতিবাচকভাবে কাজে

লাগানো যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় ফুটে উঠেছিল একটি শিরোনাম—'ক্যাপ্টেন রসিদের মুক্তির দাবিতে, কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট ঐক্য'। ছাত্র ফেডারেশনের অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মুসলিম লিগের মুয়াজ্জেম হোসেন, ছাত্র কংগ্রেসের সুপ্রভা রায়রা সে সময় ক্যাপ্টেন রসিদের মুক্তির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

'চিহ্ন' উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে ছাত্র আন্দোলনের ওই রক্তঝরা দিনগুলির কথা। আর তারই সূত্র ধরে এই উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়েছে গ্রামের জমির আন্দোলন, শহরের ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের বিক্ষিপ্ত অংশ। মায়ের কোলের বন্ধন, অথবা পার্থিব প্রলোভনের মোহজাল ছাত্রদের গৃহবন্দি অথবা শুধুই গ্রন্থবন্দি করে রাখতে পারেনি। সীতারা তাদের বের করে এনেছে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঙিনায়। সীতা মানিকের রাজনীতির ছাত্রশাখার প্রতিনিধি। সে নিজে যেমন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিয়েছে তেমনি অন্যান্য ছাত্রদেরও অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে।

হেমন্ত, সে তার মাকে বলেছে, ''কাল একটা প্রোটেস্ট মিটিং হবে, তাতে আমি যোগ দিতে চাই। মিটিং-এর পর একটা প্রোসেশনও হয়তো বার হবে, তাতেও আমি থাকতে চাই।''[৪০] প্রথম দিকে আপত্তি ছিল মা অনুরূপার কিন্তু বর্তমান রাজনীতির অভিঘাত তাকেও কিছুটা হলেও আলোড়িত করেছে, সন্তানের যুক্তি তাকেও টলিয়ে দিয়েছে।—''মার অনুমতি মানেই আশীর্বাদ। সেটা জুটল না হেমন্তর। তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মতো ভদ্র স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্তন কে অস্বীকার করবে।''[৪১]

হেমন্তর মা-র মতোই আর এক মায়ের কথা এসেছে 'চিহ্ন' উপন্যাসে। রসুলের মা আমিনা। ছাত্র বিক্ষোভে গুলি লেগে বাঁ হাতটি রসুলের যাবার উপক্রম। প্রচুর রক্ত ঝরে গেছে। মায়ের টানে হাসপাতাল থেকে ছুটে চলে এসেছে বাড়িতে, আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে ভোর রাতে মিলিত হবে হাসপাতালে আহত সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। মা আমিনাও কাঁদতে পারেনি সন্তানের সংগ্রামী উৎসাহের জন্য। রসুলের বিদায়ের সময় আমিনার অনুভূতিটাও লক্ষ করার মতো—''কে নিজের ছেলে আর কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে।''[৪২]

মূল্যবোধ হল এক ধরনের জৈব-মানসিক প্রবণতা। যার দ্বারা আপন মাকে ভালোবাসতে বাসতে অপর মায়ের বয়সীদের মাতৃস্থানীয়া ভাবা, পিতার মতোদের পিতৃস্থানীয়, ভায়ের মতোদের ভ্রাতৃস্থানীয়, বোনের মতোদের ভগ্নিসম ইত্যাদি তেমনি সন্তানের মতোদের সন্তান

সম। আর এই সূত্রেই বলা যায় এক রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মা বাবাদের মধ্যে এই মূল্যবোধ অনেকটা রাজনৈতিকভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে। তাই রসুলের মায়ের কানের কাছে অন্ধকার রাত্রিতে ধ্বনিত হয়েছে—''তোর কি শুধু একটি ছেলে?''[৪৩] ওসমানও তার ছেলের ছায়া লক্ষ করেছে গণেশের মধ্যে। এ এক অন্যরকম আত্মীয়তা।

গোর্কির 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—''ইতিহাস নিত্য বিবর্তনশীল মানবজীবন ও সাহিত্যও তাই। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও ইতিহাসের অগ্রগতি নবীন ও প্রাচীন প্রথার দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের অবসানে নবীনের প্রতিষ্ঠা।''[৪৪] এই সত্যের নিরিখে বলা যায় পৃথিবীতে এক বা ধ্রুব বলে কোনো কিছুই নেই। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনারও পরিবর্তন হতে বাধ্য। বিশেষ বিশেষ সামাজিক সংঘাতে এবং সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ চেতনার উদয় হয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছর আগে এমনই এক তাগিদ দেশ অনুভব করেছিল।

বাংলার মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এবং যুদ্ধের পরোক্ষ প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারত তথা বাংলার মানুষের মধ্যে এসেছে। যুদ্ধের সূত্র ধরেই এসেছে দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি। রেশনের দোকানের লাইন ইত্যাদি দেখে, মানুষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। তার ফলে এক বিশেষ চেতনা নির্মিত হয়েছে বলা যায়। আর এই চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল নবীন মনে। তাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিল এই পরদেশি শাসনের বিরুদ্ধে। পুরনো যাঁরা অর্থাৎ অভিভাবক শ্রেণি প্রাথমিকভাবে তাদের সন্তানদের আটকেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ভুল ভেঙেছে, তাদের কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়েছে ছোটোদের উপর। এ এক অন্য সংস্কৃতির চিহ্ন।

'চিহ্ন' উপন্যাসে যে চরিত্ররা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে তারা ছাত্র। উৎপাদনমুখী অথচ পরনির্ভর এই অংশ বড়ই সংবেদনশীল। এই অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন। ওসমান হানিফ, বুধুলালরা সমস্ত সর্বহারা জনঅংশ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ট্রাম শ্রমিকরা এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। তা বোঝা যায় ওসমানের অনুভবে। সেও একজন প্রাক্তন ট্রাম শ্রমিক। ওসমানের ''অহরহ মনে হয়েছে ট্রামের কাজে থাকলে আজ সে নিজেকে তাদেরই একজন ভাবতে পারতো।''[৪৫] শুধু ট্রাম শ্রমিকরা নয়, ঐক্যবদ্ধ ওই সংগ্রামে গ্যাস শ্রমিক ইউনিয়ন, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি শ্রমিক সংগঠন। ''মহম্মদ কদম রসুলের মৃতদেহ নিয়ে গ্যাসশ্রমিক ইউনিয়নের অফিস থেকে পাঁচ হাজার হিন্দু মুসলমানের এক শোভাযাত্রা কারখানার দিকে চলতে থাকে। বিড়ি শ্রমিক মহম্মদ জানের গুলি লাগে মঙ্গলবার রাতে। বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্টালি মহল্লায় হিন্দু মুসলমান এক বিরাট শোভাযাত্রায় তাঁর মৃতদেহ গোবরা সমাধিস্থলে নিয়ে গেল।''[৪৬] হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ

দেশপ্রেমের জোয়ারে এগিয়ে চলেছে। সবাই পুলিশ মিলিটারির চোখ রাঙানি রাইফেলের গুলিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। মুখে তাদের ধ্বনি ওঠে জয় হিন্দ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।"[৪৭]

গরিব মানুষের এমন ঐক্যবদ্ধ রূপ অতীতে দেখা যায়নি। হিন্দু-মুসলমানের এমন ঐক্যবদ্ধ চেহারা অমিল ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। সবদিক থেকেই বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ। বুঝতে পারেনি শুধু জাতীয় নেতৃত্ব। কারণ, নেতৃত্বের বাড়তি উৎসাহ ছাড়াই এই আয়োজন, মানা যায় না, এই বোধও কাজ করেছে অনেকাংশে। তৎকালীন প্রায় সব রাজনৈতিক নেতৃত্বই সাবধানী ভূমিকা পালন করতে চেয়েছে। 'চিহ্ন' উপন্যাসে তার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসের একটি চরিত্র অমৃত মজুমদারের কথাবার্তায় তৎকালীন সুবিধাবাদী নেতৃত্বের স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে। স্ত্রী বীণার প্ররোচনায় অমৃত বিক্ষোভকারীদের থামাতে এগিয়ে যায়, এই সুযোগে নেতা হওয়ার বাসনায়, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে না। ''সশস্ত্র আক্রমণ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে তারই আলোয় এখনকার শান্ত পরিস্থিতিকেও অমৃতের অপরিচিত ধারণাতীত মনে হয়। সে অনুভব করে তার এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না আজকের অবস্থা। তার জানাশোনা ধরাবাঁধা পুরানো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটেনি। তার পক্ষে এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন—হয়তো অসম্ভব।"[৪৮]

'জানাশোনা', 'বাঁধাধরা' পুরনো নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এক নিয়ম ভাঙার নিয়ম নির্মিত হয়েছে। সেই নির্মাণ এক স্বাভাবিক নিয়ম। এই নির্মাণে সহায়তা করেছে সর্বহারা অংশ। মধ্যবিত্ত জনঅংশও অঙ্গীভূত হয়ে গেছে মানুষের সংস্পর্শে।

''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল ও অব্যবহিত উত্তরকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির রদবদল মধ্যবিত্তের চেনা আদলকেই পাল্টে দিয়েছিল। পরিস্থিতিই মধ্যবিত্তকে স্বরচিত শ্রেণি-আগল ভেঙে শ্রেণিহীনতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।"[৪৯] অফিস থেকে ফেরার পথে অক্ষয় রোজ মদ খেয়েই ফেরে, প্রতিদিনই সে প্রতিজ্ঞা করে সে আর মদ ছোঁবে না কিন্তু মনের জোর অক্ষয় অর্জন করতে পারে না। পশুর মতো স্ত্রী সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে। কিন্তু ''আজ তাকে মদ না খেয়ে আসার নেশাও ধরেছে।"[৫০] সে দেখেছে ছোট ছেলেমেয়েদের মনের জোর, কিভাবে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে। সংগ্রামী জনতার বিপ্লবী উত্তেজনা তার মদের নেশার থেকেও তীব্র। ''এই প্রথম ওই নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু-একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু-একবারের বেশি আর খাবে না, কারণ ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।"[৫১] অক্ষয়

আজ ওই ছেলেগুলোর জন্য নেশা করতে পারেনি। ছেলেগুলোর আন্দোলন তাদের সাহস, আত্মপ্রত্যয় অক্ষয়ের রূপান্তরে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অক্ষয় গোত্রান্তরিত হতে পেরেছে। সত্যপ্রিয় ঘোষ মনে করেন—''এই উপন্যাসের নেশাগ্রস্ত অক্ষয় চরিত্রটি লেখকের নিজের জীবনের প্রতিভাস।''[৫২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়পর্বে বিভিন্ন আন্দোলনের অভিঘাত মধ্যবিত্তকে ঘর থেকে টেনে এনেছিল লড়াইয়ের ময়দানে। সে-রকমই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মাধু অর্থাৎ অজয়ের বোন সেও অজয়দের সঙ্গে জনতার সংগ্রামকে সংহতি জানাতে এগিয়ে গেছে। অজয় অফিস কামাই করেছে ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছে। যাদবদের গণেশের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে অজয়ই। ফিরে এসে মিলিত হয়েছে শোভাযাত্রায়। সন্তানকে খুঁজে না পেয়ে শোভাযাত্রার সামনের সারিতে অজয়কে দেখে যাদব ডাকে—''বাবু!'' অজয়রা এগিয়ে যায়, পিছনে তাকায় না। যাদব হারানো সন্তানকে খুঁজে পায় সংগ্রামী জনতার মধ্যে। ''ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দেখে সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়েছে।''[৫৩]

গণমানুষ আছে, তাদের সংগ্রামী মেজাজ আছে, সমাপ্তিতেও রয়েছে সংগ্রামী প্রত্যয়। তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি গণসাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে পেরেছে 'চিহ্ন'।

'কমিন্টমেন্ট'-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে রেমন্ড উইলিয়াম বলেছেন, ''Commitment, if it means any thing, is surely conscious, active and open; a choice of position.''[৫৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ করে গোত্রান্তরিত মানিক প্রতিশ্রুত জনতার মুখে ভাষা দিতে, দায়বদ্ধ জনজীবনের যন্ত্রণাকে রূপায়িত করতে। দায়বদ্ধ মধ্যবিত্ত বিলাসিতার ক্ষতচিহ্নকে চিনিয়ে দিতে। আর এই দায়বদ্ধতা থেকেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্র রূপদানে সচেষ্ট হয়েছেন, এবং সফল হয়েছেন বলাই যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন সংস্কৃতির আবাহন করেছেন। তিনি অনাগত নতুন সংস্কৃতির 'চিহ্ন স্বরূপ' চিহ্ন লিখলেন। আঁকলেন বিপ্লবের পদচিহ্ন—যা নেহাতই চিহ্ন স্বরূপ যা দেখে অনাগত বিপ্লবী দিন উৎসাহিত হবে। সেই আশাই কথারূপ পেয়েছে 'চিহ্ন' উপন্যাসে।

■ স্বাধীনতার স্বাদ

স্বাধীনতার স্বাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিংশতিতম উপন্যাস। গ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু উপন্যাসটি লেখা হয় তারও তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭-এ। 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা' থেকে প্রকাশিত উপন্যাসটিতে একটি উৎসর্গপত্র আছে,

যাতে লেখা আছে—''সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম জনগণই মানবতার প্রতীক।''[৫৫]

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের পর কলকাতায় যে বিভৎস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা চলে তাকেই প্রেক্ষাপট করে এই উপন্যাসটি রচিত। কিন্তু দাঙ্গা, মন্ত্রিমিশনের বিরোধিতা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনার ভিতর বড় হয়ে উঠেছে উপন্যাসের নায়িকা মনিমালার আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনি।

প্রথম দিকে মণিমালার জীবন ছিল আত্মকেন্দ্রিক। একান্নবর্তী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধ্যাপক স্বামীর একলা নিজস্ব সংসারই হয়েছিল মনির একমাত্র ঠিকানা। স্বামী সন্তানসন্ততিদের নিয়ে মণিমালা বেশ স্বাধীন ও শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল। সেই সংসারের গৃহিনীপণায় সে খুঁজে পেয়েছিল আপন স্বাধীনতা। কিন্তু বাইরের অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিবেশ তাদের সংসারেও ধেয়ে এল। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করলে পূর্বতন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবার প্রস্তাব নিয়ে এল দেওর প্রণব। সুশীল মণিরা ফিরে গেল পূর্বতন সংসারে। মণি উপলব্ধি করল অন্য এক পারিবারিক জীবনের আস্বাদ। নিজের আবেগ ও কিছুটা অহংকার ওই বাড়ির পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে প্রণব, গোকুল, গিরিনবাবু, নীলিমা, সরস্বতীদের সংস্পর্শে ভালোভাবেই মানিয়ে নিল মণি। এদিকে মনির স্বামী সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল বাল্যবন্ধু বর্তমানে চোরাবাজার চূড়ামণি যতীনের সঙ্গে। আর এদিকে মণি তার আবেগের স্তর অতিক্রম করে অনেকটা বাস্তববাদী। বামপন্থী সংস্রব তার মধ্যে রূপান্তর এনেছে। ''সেই সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নারীর যথার্থ স্বাধীনতার পথটিও আবিষ্কৃত হয়েছে।''[৫৬] বাইরের রাজনৈতিক উত্তাপকে অনুভব করতে চেয়েছে আপন সন্তান সন্ততি সহ। সশরীরে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়েছে, পুলিশের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কন্যা আশার মুখ। মণি আপন সন্তানের রক্তের বিনিময়ে উপলব্ধি করেছে প্রকৃত স্বাধীনতা। আর এই উপলব্ধি সাথে সাথে স্বাধীনতার মানেটাও দ্বিমাত্রিকতা লাভ করেছে। একদিকে দাঙ্গা দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা অন্যদিকে সেই স্বাধীনতার বিরোধিতা করে সংসারের নিষেধের ঘেরাটাপকে উপেক্ষা করে বৃহৎ জনসমুদ্রের আন্দোলনে আন্দোলিত সংগ্রামী উত্তেজনায় নিজেকে শরিক করতে পারার অনাবিল আনন্দ। অন্যদিকে সুখী সমৃদ্ধিশালী জীবনের জন্য বন্ধু যতীনের ফাঁদে পা দিয়ে স্ত্রীপুত্রকন্যা পরিবার ত্যাগ করে সুশীল আপন সর্বনাশকে ডেকে এনেছে। বন্ধু যতীন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভুল বুঝেছে সুশীল। চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে তাকেই বাঁচাতে ছুটে গেছে তারই পরিবার।

দাঙ্গা কবলিত মণিমালাদের খবর নিতে আসা মামা প্রমথর মৃত্যু দিয়েই উপন্যাসের শুরু।

তার পরই লেখক খুব সুন্দরভাবে সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতের কিছু ঘটনাবলী। ''সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ আন্দোলন, পুলিশের গুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায় সে ফিরবে কিনা জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কিনা জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়।... কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার, হাঁড়িচড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।''[৫৭] এই সূত্রেই উপন্যাসটি গতি লাভ করেছে। একদিকে স্বাধীনতার বাইরের আপেক্ষিক অর্থে দাঙ্গা, দেশভাগের চক্রান্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত ইত্যাদির চিত্র অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থের নিরিখে নিজ ব্যক্তিত্বের সন্ধান। এই উপন্যাসের নায়িকা মণি ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ চায়। সে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। কেমন সেই স্বাধীনতা?

জে. এন. জয়পালান, হেরল্ড লাস্কিকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, ''Liberty means the eager maintenance of the atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. It is a product of rights, without rights, there can be no liberty because in that case men are the subjects are the how unrelated to the need of personality.''[৫৮] অর্থাৎ স্বাধীনতা হল সমাজব্যবস্থার সেই সকল মাধ্যম বা সুযোগ যার দ্বারা ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাতে পারে। সেই দিকটি লেখক মণির আত্মোপলব্ধির দ্বারা নিজের বন্ধনমুক্তি ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যা অর্থহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত, সেই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য—উপরতলার মানুষের উৎসাহ আর তার জন্যই দাঙ্গার উসকানি।

১৯৪৬-এর দাঙ্গার ফসল স্বাধীনতার স্বাদ। এর ইতিহাসটি একটু দেখা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিভিন্ন দিক থেকে ভারতের স্বাধীনতার দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশে ভারতে মন্ত্রিমিশন প্রেরিত হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা ভারতে আসেন। শুরু হয় আলাপ আলোচনা। সেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে অংশ নেয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ বৃহত্তর দল হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। সারা দেশে প্রাদেশিক আইনসভায় কমিউনিস্টরা ''১০৮টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়ে ৮টি আসন ও ৭ লক্ষ ভোট পেয়ে তৃতীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।''[৫৯] মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে কংগ্রেস লীগের আলোচনায় স্থির হয়—''British India was to be divided into

three groups of provinces; one comprising the Punjab the north west frontier province, Sind and Baluchistan, a second comprising Bengal and Assam; and the third rest."।[৬০]

এছাড়া ঠিক হয় উপরোক্ত তিনটি শ্রেণিভুক্ত প্রদেশগুলি স্ব স্ব এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করবে। এসব সিদ্ধান্ত দ্বারা পাকিস্তান গঠন সম্ভব ভেবে লিগ মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এদিকে ইংরেজ যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে তাতে কংগ্রেস যোগ দিতে অস্বীকার করে। মুসলিম লিগ লর্ড ওয়াভেলকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকে। কংগ্রেসের চাপে তা সম্ভব হয় না। অসন্তুষ্ট হন জিন্না। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা বাতিল করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। ইতিহাসবিদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—''ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আগ্রহী অথচ তা করার আগে তারা পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দিচ্ছে না—এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মৌল উদ্দেশ্য।"[৬১]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট বাংলার মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। চারদিন ধরে কলকাতা শিকার হয় বিভৎস দাঙ্গার। ''চার দিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নরনারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত, ১৫ হাজারের মতো আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তর করে দেশবিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়।"[৬২] এর ফলে দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সময়কালে হিন্দুমহাসভা স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের ডাক দেয়। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লিতে এক বক্তৃতায় বলেন, ''We shall demand the creation of a new province composed of the Hindu majority areas in Bengal."[৬৩] সোহরাবর্দিও স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলার দাবি করেছিলেন কিন্তু জিন্না তা মানতে চাননি। এই সমস্ত পরিস্থিতিই কলকাতার দাঙ্গার অন্যতম কারণ। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ''নেতাদের একরোখা উদ্ধত মনোভাবের প্রভাব জনসাধারণের উপরও পড়েছিল। ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য দু-দলই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। আঘাতটা নিঃসন্দেহে এসেছিল লিগের দিক থেকেই। লিগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দির প্রত্যক্ষ মদতও ছিল; কিন্তু তারপর হিন্দুরাও সমানভাবে পাল্টা আক্রমণ করে।"[৬৪] তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ছিল সংস্কৃতির পক্ষে। তাদের মতে কলকাতার দু-একটা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল, তাছাড়া বৃহত্তর বাংলায় এর প্রভাব পড়েনি এবং কৃষক মজুর অংশে সেভাবে ভেদবুদ্ধিকে ছড়ানো যায়নি। তৎকালীন লিগ মন্ত্রিসভার মজুর শ্রেণির

উপর নিপীড়ন বিষয়ে উল্লেখ করে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি বলছে—''যে কায়েমি স্বার্থ মজুর ও কৃষকদের দমন করে সেই কায়েমি স্বার্থই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে।''[৬৫] তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক ও মজুর শ্রেণির ঐক্যের সপক্ষে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপক্ষে অবস্থানকেই নির্দিষ্ট করেছিল। ফলে শ্রমিক ও মজুর শ্রেণি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে দূরে ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির দলিল জানাচ্ছে—''কলিকাতার দাঙ্গার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই জানেন যে, দাঙ্গার সময় ট্রাম এবং পোর্টের হিন্দু মুসলমান মজুর সম্মিলিতভাবে ধর্মঘট চালাইয়াছে; তাহারা দাঙ্গা করে নাই বরং দাঙ্গা থামাইবার চেষ্টা করিয়াছে।''[৬৬]

তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি আশা প্রকাশ করেছে—''হিন্দু মুসলমানের মিলনে সমৃদ্ধ মজুর কৃষকের অভিযানের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী অকুণ্ঠভাবে দশের চক্ষে খুলিয়া ধরিলে সাম্প্রদায়িকতা দুর্বল হইয়া পড়িবে।''[৬৭]

একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতার স্বাদ' লিখছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের বোঝাপড়া তাদের কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয় সেইখানে দানা বাঁধবে। উপন্যাসে দেখেছি দাঙ্গা কবলিত মানুষরা আশ্রয় নিয়েছে বামপন্থী কর্মী প্রণবের বাড়িতে। মণিমালারাও উঠে এসেছে ওই বাড়িতে কারণ পাড়াটা কিছুটা নিরাপদ। অনেক মানুষ সেখানে একসঙ্গে থাকার সাহসও দেখায়। প্রণবের মতোই গোকুলও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত। ওই বাড়িতে সান্ধ্য অথবা রাত্রিকালীন বৈঠকে দাঙ্গার প্রকৃতি, পরিধি, কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। মণিমালা সরস্বতী নিলীমারাও সেই আলোচনায় অংশ নেয়। সেখানকার আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হয়। ফুটপাতবাসী গোবরকুড়ানি এক মুসলিম বৃদ্ধা তার আপন আচরণের গুণেই সে সকলের নানি হয়ে উঠেছিল তাকে দাঙ্গার সময় হত্যা করে ঐ পাড়ায় উত্তেজনাপ্রসারিত করা হয়। খবরের কাগজের সব এডিটর গিরিনবাবুর কবিবন্ধু মনসুর দাঙ্গায় আক্রান্ত হলে হিন্দু বন্ধুকে অবিশ্বাস করে। স্বাভাবিকভাবেই এই উপন্যাসে মানিকের উপলব্ধি 'দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা'[৬৮] সাধারণ মানুষ দাঙ্গার বাইরেই থাকতে চায়। ''সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে নামানো হয়, তাদের দিয়ে দাঙ্গা করানো হয়।''[৬৯]

গরিব হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করেনি, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন—''মজুর শ্রেণি সব চেয়ে দাঙ্গাবিরোধী।''[৭০] কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা গোকুল বলেছে—''শ্রেণিটাই মানুষের আসল পরিচয়।''[৭১] অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান পরিচিতি সত্তার বাইরে শ্রেণি-সত্তা বা শ্রেণি পরিচয়কেই প্রাধান্য দিতে চান মানিক। গিরিনবাবু তাঁর কবি বন্ধুর হিন্দু নাম বলে মনসুরকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখেছি

উপন্যাস অংশের বস্তি অঞ্চলে এই দাঙ্গার উত্তেজনা পৌঁছায়নি। তেলেভাজাওয়ালি দুর্গা আশ্রয় দিচ্ছে নানির ছেলে নাজিমকে। যদিও প্রথমে টাকার প্রলোভন ছিল দুর্গার কিন্তু লড়াই-এর লাইনে লড়তে গিয়ে তারা ভুলে গেছে টাকা জাতপাত ইত্যাদি। দুর্গা, নাজিম আটকে থাকেনি হিন্দু-মুসলিম পরিচিতি সত্তার মধ্যে। তারাও হয়ে উঠেছে মেহনতি সমাজের প্রতিনিধি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে ডাক জিন্না দিয়েছিলেন, আর যার ফলশ্রুতিতে দাঙ্গা, তার আলোড়ন নিচেরতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আর তাই তো—''একটি মুসলমান প্রধান এলাকার দেখা গেল অন্ধকার ঘরের ভিতর ৮-১০ জন হিন্দু শ্রমিক খাইতে বসিয়াছেন, দরজায় কয়েকজন মুসলমান শ্রমিক পাহারা দিতেছেন।''[৭২] উপন্যাস অংশে গোকুল দাঙ্গার সময়ের এই ঘটনাকে ইতিবাচক বলে মনে করেছে।

ছিন্নমস্তা স্বাধীনতার লোভে উদ্‌গ্রীব তৎকালীন উপরতলার রাজনীতিকরা যে বীভৎস দাঙ্গাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল তা প্রচণ্ড লজ্জার। কংগ্রেস আর লিগের প্রতি লেখকের বিতৃষ্ণাবর্ষিত হয়েছে। গোকুলের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন—''কংগ্রেস লিগের মিলন আর হিন্দু মুসলিম ঐক্য কি এক জিনিস? আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি তা নয়। কংগ্রেস লিগের মিলন যদিই বা সম্ভব সে হবে উপরতলার মানুষের স্বার্থে।''[৭৩] তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যও খানিকটা ঐ রকমই—মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তাহার সমর্থকদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ক্ষমতা আদায়ের জন্য সম্মিলিত সংগ্রামকে ইচ্ছাপূর্বক অস্বীকার করিয়া এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের আহ্বান জানাইয়া সাম্রাজ্যবাদের গৃহযুদ্ধের চক্রান্তকে সফল করিবার সহায়তাই করিয়াছে।''[৭৪]

উপরতলার কিছু মানুষ দেশের মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে আংশিক ও নকল স্বাধীনতা কিনতে চাইছে, দেশে আগুন জ্বালাচ্ছে সে বিষয়টিও উপন্যাসে উঠে এসেছে।—''সোজাসুজি এদেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্তশোষার সাধ্য আর ইংরাজের নেই। তাই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা দিয়ে পরোক্ষ দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে।''[৭৫]

উপরিউক্ত বিষয়টি প্রণব গোকুল গিরিনবাবুদের উপলব্ধি ঐ উপলব্ধির সঙ্গে তৎকালীন বামপন্থী শিবিরের বোঝাপড়ার অনেকাংশে মিল আছে। প্রণব গোকুলরা বিষয়গুলি শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখেনি, সভাসমিতি সংগঠিত করা বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির উদ্যোগ নিয়েছে।

ইংরেজ শেষ মরণকামড় দিয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছে। প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার প্রত্যাশায় তৎকালীন জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্বের একাংশ ইংরেজের হাতের পুতুলের মতো নেচেছে। সেই কায়েমি স্বার্থের মানুষ কিছু ভেদবুদ্ধির স্বার্থপর মানুষকে উত্তেজিত করে দাঙ্গার

মতো অভিশাপকে নামিয়ে এনেছে। তার ফল ভোগ করেছে সাধারণ মানুষ। উপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুশীল সে অধ্যাপক, সেও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা থেকে ভোগসর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ হল চোরাবাজার, কালোবাজারি সেই কালোবাজারি যতীনও বুর্জোয়াসুলভ মানসিকতায় সুশীলকে নাচিয়েছে, ব্যবসায়িক সহচর তৈরি করতে চেয়েছে আর তার ফল ভুগতে হয়েছে মণিমালাকে। সাধারণ মানুষ যেমন ইংরজে তথা তৎকালীন স্বার্থপর উচ্চ শ্রেণির মানুষের হাতের পুতুল তেমনি মণিকেও সুশীল পুতুল করে রাখতে চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার দাপটে ও পাতিবুর্জোয়াসুলভ মানসিকতায়। সাধারণ মানুষও অবদমিত, শৃঙ্খলিত, মণিও তাই। অর্থাৎ সাধারণ দাঙ্গার আগুনে পোড়া মানুষদের সমস্যা যা মণিরও সমস্যা প্রায় একই, তাই সমস্যা সমাধানের পথটাও অভিন্নই থেকেছে।

প্রথম দিকে মণি বিচ্ছিন্ন থেকেছে। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ি সে নিজে। ''অন্য সবার সাথে থাকার দায়িত্ব ঝক্কি আর বিড়ম্বনা এড়িয়ে নিজেদের রোজগার শুধু নিজেদের জন্য খরচ করে নিজেদের মনের মতো স্বাধীন সুখী নীড় গড়ার''[৭৬] উদ্দেশে সে একান্নবর্তী সংস্রব ত্যাগ করেছিল। সব একতরফাও ছিল না। একান্নবর্তীর আবদারও মণিকে অনেকখানি অবদমিত করে রেখেছিল, তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছিল না, সেই অভিমানও মণির ছিল। তাই—''বাড়ি ছাড়বার সময় মুখ ভার করে নয়, সবার কাছে কেঁদেই সে বিদায় নিয়েছিল।''[৭৭] সুশীলের সংসারে মণি গৃহিণীর স্বাধীনতা পেয়েছিল কিন্তু নিজেকে মেলাতে পারেনি। ''স্বাধীন সুখী জীবনের কল্পনায় মশগুল আত্মহারা হয়ে ভিন্ন বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছে সেটা আরও ছোট খাঁচা আরও বৈচিত্র্যহীন পরাধীন জীবন?[৭৮] দাঙ্গা তাকে আবার একান্নবর্তী পরিবারে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। মণি এখানে এক প্রকার সহযোগ নির্মাণ করেছে। সেই সহযোগ—যার দ্বারা মানুষ একত্রিত হয়, দল গড়ে, একসঙ্গে বাঁচে। মণি এখানে এসে উপলব্ধি করল—''চাই না আরাম। মিলে মিশে কষ্ট অসুবিধা সওয়ার চেয়ে সুখ আছে?''[৭৯] অসুবিধার রাজ্যে সে প্রসারিত স্বাধীনতাকে অনুভব করেছে। নাজমা জেসমিন চৌধুরী লিখেছেন—''মণি যেন এদেশের এতদিনকার চলে আসা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক।''[৮০] নীরব সহিষ্ণু যে আন্দোলন তারই প্রতীক। কিন্তু পাতিবুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির সহযোগী সুশীল যখন আপন আধিপত্যকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে মণির উপর তখনই মণি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আত্মমুক্তির অভিমুখ খুঁজেছে বামপন্থী সংস্রবে। বাড়ির বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতা যখন শত্রু, প্রতিবাদ না করাটাই তখন অপরাধ, শোষণমুক্তিই মানবমুক্তির অন্যতম পথ—এই সব উপলব্ধি মণির চেতনায় সঞ্চারিত হয়। সে লড়াই আন্দোলনের একজন হতে পারে না বলে তার আক্ষেপ হয়েছে। সে বলেছে—''রাঁধা বাড়া

বাসনমাজা ছেলে বিয়োনো আমার কাজ। দেশবিদেশ যুদ্ধ বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ মার্কসবাদ এসব কি আমার জন্য?"[৮১] নাজমা জেসমিন চৌধুরী লিখেছেন—"মণিমালার অনুভূতি মুহুর্মুহু বদলাচ্ছে, পাঁচমিশালি মধ্যবিত্ত জীবনের যে দ্রুত খরগতি জনজীবনমুখী সেই জীবনের কাছে মণি পাঠ নিচ্ছে।"[৮২]

মণিমালা বাংলা উপন্যাসে অন্যতম বামপন্থী নারী চরিত্র। নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে মেজবৌ; মানিকের 'চিহ্ন' উপন্যাসে 'সীতা' আর মণিমালা এরা অনেকটা মনোগত দিক থেকে এক। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগী কণ্ঠস্বর মণিমালায় পাওয়া গেছে। মণি দাঙ্গাপীড়িত মানুষদের নিয়ে একত্র বসবাসে আনন্দ পেয়েছে। এই একত্রবাস কতকটা 'কমিউন' কালচারের সঙ্গে মেলে।—"এক পরিবারের মানুষের চেয়েও এ বাড়ির লোকেদের মধ্যে এমন আপন ভাব, প্রেমোচ্ছ্বাস বা হিংসা বিদ্বেষের এমন অভাব যে সবসময় মণির সত্যি খেয়াল থাকে না। এখানে বাপ ভাই মা বোন ছেলে মেয়ে নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ঘরোয়া পরিবার বাস করে না।"[৮৩] এই একত্র স্বচ্ছন্দ জীবনের স্বাদ যেন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ। এই স্বাদই যেন মণি খুঁজেছে। —"এ মিলিত জীবন এদের খেয়াল নয়, নাটুকেপনা নয়—সহজ সরল হিসাব যে সকলের মিলিত এই জীবনকে যতদূর সম্ভব সুস্থ ও সুন্দর করায় সবারই লাভ।"[৮৪]

শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঙিনায় নিজে অংশ গ্রহণ করেছে। আপন সন্তানদের মুক্তির স্বাদ দিতে সংগ্রামের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। পুত্র সুধীন গোকুলের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে চাইলে সুশীল তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। মণি স্পর্ধা ভরে সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলেছে—"সুধী তুই যদি কাপুরুষের মতো হার মানিস, গোকুলের সঙ্গে না যাস জীবনে তোর মুখ দেখব না। তোকে পেটে ধরেছি বলে, প্রায়শ্চিত্ত করব।"[৮৫] স্বামীর আপত্তিকে অস্বীকার করে পুত্র সুধীন ও কন্যা আশাকে রাজনৈতিক সভায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া তখনই সম্ভব, যখন মনোজগতে মতাদর্শের ভিত্তিটা সুদৃঢ় হয়। মণি সেই উচ্চতর চেতনার মতাদর্শের প্রাচীর নির্মাণ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' সিরিজের গল্পগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই বৌ-রা কেউই আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়—কেউ স্ত্রী, বৌমা, গৃহিনী, জননী ইত্যাদি। স্বামী অথবা পরিবার কেউ না কেউ তাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করে বসে আছে। 'দোকানীর বৌ', 'সাহিত্যিকের বৌ', 'কেরানির বৌ', 'বিপত্নীকের বৌ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' ইত্যাদি গল্পে ওই সত্য প্রতিষ্ঠিত। পুরুষ ততটুকুই নারীকে স্বাধীনতা দেয়, যতটুকু পুরুষ চায়। সুশীলও মণিকে ঠিক ততটুকুই দিতে চেয়েছিল। তাই বাইরে যে স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদ লুকিয়ে আছে মণি তা জানাতে পেরেছে মার্কসীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়। যখনই সেই স্বাধীনতা মণি ছুঁতে গেছে সুশীলরা তাকে তখনই টেনে ধরেছে। এই টান সামন্ত-মনোভাবাপন্ন

পুরুষতন্ত্রের টান। মণি তাকে ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে। ব্যতিক্রমী চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে মণি।

মণির এরূপ রূপান্তরে সুশীলের মনে হয়েছে তার সংসারটা চুরমার হয়ে গেছে। এই ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়াটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এক সহযোগ নির্মাণের ইঙ্গিত। সমাজে এই ভাঙনগড়ন চলছেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন ''সমাজে কোন শ্রেণিতে ভাঙন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিও ভেঙে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজজীবনে ভাঙন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবে।''[৮৬] মণিমালার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। নতুনভাবে নতুন কালকে সে বুঝেছে। পুলিশের আক্রমণে আহত বিকৃত মুখের আশাকে গোকুল কত সুন্দর দৃষ্টি দেখেছে এবং তাকে জীবনসঙ্গী রূপে মেনে নিয়েছে। সুশীলও শেষ পর্যন্ত তার ভুল বুঝতে পেরেছে, ইত্যাদি।

এই উপন্যাসটির বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সরাসরি এই উপন্যাসটি না হলেও এই পর্যায়ের উপন্যাস বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা এসেছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন—মানিকের ''পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে শিল্প রূপায়ণের জায়গা নিয়েছে সরব প্রচার, সেকারণেই সেগুলি সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।''[৮৭] অধ্যাপক উদয়চাঁদ দাশও ওই মতের সমর্থক। সরাসরি 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—''বেশি প্রচারাত্মক স্বভাব উপন্যাসের শিল্পীত রূপের ক্ষতি করেছে।''[৮৮]

সাহিত্যকে তো অনেকে সময়ের আরশি বলেন। সময়কে ধরতে চেয়েছেন মানিক। সময়ের প্রতিচ্ছবিকে বাস্তবানুগ শিল্পরীতিতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়ও লেখকের আছে। উক্ত আলোচনাগুলির উত্তরও আমরা খুঁজে পাই মালিনী ভট্টাচার্যের লেখায়। তিনি লিখেছেন—''চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন, দাঙ্গা ও দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের যে দ্রুত পরিবর্তন তাকে ধরতে হলে আঙ্গীকের নবীকরণ যে অবশ্যম্ভাবী তা তিনি বুঝেছিলেন। এই সময়ের উপন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে যাকে গল্পের বাঁধুনির শৈথিল্য বলে মনে হয়, একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় তার মধ্যে আছে নিটোল উপন্যাসের প্রথানুগ ধারণাকে পাল্টে দেবার আয়োজন। গল্পের বহুকেন্দ্রিকতা ও কথোপকথনের প্রাধান্য অনেক সময়ই শৈল্পিক দৌর্বল্যের লক্ষণ নয়, শিল্পের এক ভিন্ন মানদণ্ডের অনুসন্ধান।''[৮৯]

বিশ্বযুদ্ধের বোমাবারুদ, দাঙ্গার রক্তপাত, দুর্ভিক্ষে আর্ত মানুষের চিৎকার—এসব বাস্তবতাকে তৎকালীন সময়ে অস্বীকার করা যায় না। সংশয়ী ভঙ্গুর সময়ের কথারূপ 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসটি।

উল্লেখপঞ্জি

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী/৫*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, জীবনপঞ্জি, পৃ. ৫২৯

২. সেহানবিশ, চিন্মোহন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন', '৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে', রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯১

৩. রায়, অলোক, 'বিতর্কিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা ১৪১৪, মানিক সংখ্যা, কলকাতা, তাপস ভৌমিক (স.), পৃ. ৯

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *লেখকের কথা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৪

৫. ভট্টাচার্য, মালিনী, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩

৬. *লেখকের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, মাঘ, ১৪০১ (ব.), পৃ. ১০১

৮. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমিউনিস্ট পার্টি', *পশ্চিমবঙ্গ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, সুপ্রিয়া রায় (স.), ১৪১৬, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ৭১

৯. চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৬ (ব.), পৃ. ১৪৭

১০. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, 'দুই কথাকার : মানিক ও তারাশঙ্কর', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), কলকাতা, মানিক সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৪, পৃ. ২৫

১১. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ*, এন.বি.এ, কলকাতা, পৃ. ২৪৩-৪৪

১৩. সাহা, দিলীপ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোটোগল্প, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), মানিক সংখ্যা, বইমেলা, ১৪১৪, পৃ. ২২০

১৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, *ভারবি*, কলকাতা, পৃ. ১৮৬

১৫. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : বাঙালির মনন ও সাহিত্য', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (স.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০১০, পৃ. ১২৫

১৬. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৫৭

১৭. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, 'এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ : বাংলার ছাত্র আন্দোলন (১৯৩৭-৪৭)', *মুক্তিসংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ*, বরুণ দে (স.), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ১৭৫

১৮. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১২.০২.১৯৪৬

১৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৫৭

২০. চক্রবর্তী, শঙ্করপ্রসা, 'মানিক : ছাত্র আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় কথাকার', *পশ্চিমবঙ্গ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯, তথ্য সংস্কৃতি ও বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৫৪

২১. তদেব

২২. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯৫

২৩. 'মানিক : ছাত্র আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় কথাকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
২৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৪৮১
২৫. ভট্টাচার্য, মালিনী, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪
২৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫, পৃ. ৪০৫
২৭. মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৫
২৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০
২৯. তদেব, পৃ. ৭৭১
৩০. তদেব
৩১. *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ১৩-০২-১৯৪৬
৩২. তদেব
৩৩. তদেব
৩৪. 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
৩৫. দাশ, সুস্নাত, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১২১
৩৬. রায়, অলোক, *বিশ শতক*, প্রমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২২৯
৩৭. 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৩৮. *স্বাধীনতা*, ১৫.০২.১৯৪৬
৩৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯
৪০. তদেব, পৃ. ৪১২
৪১. তদেব, পৃ. ৪১৩
৪২. তদেব, পৃ. ৪১৫
৪৩. তদেব
৪৪. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, *মাকসীয় সাহিত্য তত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬২
৪৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২
৪৬. 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৪৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫
৪৮. তদেব, পৃ. ৩৯৪
৪৯. চক্রবর্তী, অলোক, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত, গোত্রান্তরিত মধ্যবিত্ত', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (স.), মানিক সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, ১৪১৪, পৃ. ২০৯
৫০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫
৫১. তদেব, পৃ. ৪১৬
৫২. ঘোষ, সত্যপ্রিয়, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্বান্তর', *কলেজ স্ট্রিট পত্রিকা*, দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায় (স.), জুন, ২০০৮, পৃ. ৪৩
৫৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

৫৪. Marxism and Literature, Oxford University Press, 1977, p. 200
সূত্র : মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, *মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিন, কলকাতা, ২০০৬
৫৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪
৫৬. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
৫৭. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৭০
৫৮. Jayapalm, N, *Comprehensive History of Political Thought*, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 27, 2001, p. 323
৫৯. *স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
৬০. Mazumdar, R.C.; Roychoudhury, H.C. & Dutta, Kalikinkar, *An Advanced History of India*, MacMillan, India, 4th ed., Reprint 1991, p. 979
৬১. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, *দেশবিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ১৯৯৩, পৃ. ৮৫
৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯
৬৩. *Amrita Bazar Patrika*, 28 April, 1947
৬৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'বিশ শতকের বাঙালি সমাজ: হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু (স.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫৬
৬৫. ঘোষ, অরুণ (সংকলক), *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, দলিল সংগ্রহ-৪*, সেরিবান, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭১
৬৬. ঐ, পৃ. ৭২
৬৭. ঐ, পৃ. ৭৩
৬৮. *স্বাধীনতা* পত্রিকা, ২১ আগস্ট, ১৯৪৬
৬৯. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩০১
৭০. তদেব, ৩০৩
৭১. তদেব
৭২. *স্বাধীনতা* পত্রিকা, ২১ আগস্ট, ১৯৪৬
৭৩. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪
৭৪. *স্বাধীনতা* পত্রিকা, ১২ জুলাই, ১৯৪৬
৭৫. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪
৭৬. তদেব, পৃ. ২৭০
৭৭. তদেব, পৃ. ২৬৩
৭৮. তদেব, পৃ. ২৭৫
৭৯. তদেব, পৃ. ২৭৬
৮০. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
৮১. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩২৪

৮২. *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

৮৩. *রচনাসমগ্র*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৮৪. তদেব, পৃ. ২৯৮

৮৫. তদেব, পৃ. ৩৬৭

৮৬. লেখকের কথা, *মানিক গ্রন্থাবলী*, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১

৮৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০০

৮৮. দাশ, উদয়চাঁদ, 'উত্তর মানিকের উপন্যাস আস্বাদ, স্বাধীনতার স্বাদ', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা, ১৪১৪, মানিক সংখ্যা, তাপস ভৌমিক (স.), পৃ. ১১৫

৮৯. ভট্টাচার্য, মালিনী, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২৪

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)

■ তিলাঞ্জলি (১৯৪৪)

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর হাজারিবাগে সুবোধ ঘোষের জন্ম। পিতা সতীশচন্দ্র ঘোষ, মাতা কনকলতাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান সুবোধ ঘোষ ছোটোবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। হাজারিবাগ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ওই শহরেরই সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে পড়া শেষ করতে পারেননি তিনি।

সুবোধ ঘোষের পেশার জীবন বিচিত্র। অভিজ্ঞতা অর্জনও সেই সূত্রে বিচিত্র। জীবিকার প্রথম শুরু হাজারিবাগেই। তখনকার কুলি বস্তিতে কলেরার মড়ক লাগায় মিউনিসিপ্যালিটি এই রোগগ্রস্ত মহল্লায় টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করলে সুবোধ ঘোষ সেখানে যোগ দেন। সেই কাজ যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। হাজারিবাগ শহরের নাইট সার্ভিসের বাসে কন্ডাক্টরের কাজও করেন। পরে সার্কাসের লটবহর বওয়ার কাজে যোগ দেন। এরপর দীর্ঘদিন বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসজীবন কাটান বেশ কিছুদিন। পরবর্তী সময় পর্বে স্বাধীনভাবে ব্যবসার কাজে নামতে বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন। দোকানে দোকানে কেক পাঁউরুটি সাপ্লাই দেওয়ার কাজ করতেন সেখানে।

'আনন্দবাজার' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বদান্যতায় সুবোধ ঘোষ ওই পত্রিকার ছাপাখানা গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফ রিডারের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পরে যোগ দেন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগে। সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন স্বনামধন্য সাগরময় ঘোষকে। একই সঙ্গে মারকাস স্কোয়ার সংলগ্ন একটি বোর্ডিং-এ থাকতেন। সাগরময় ঘোষ লিখছেন—''১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।... তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফ রিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন আর আমি ছিলাম 'যুগান্তর' পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে।... অমরা একই ঘরে বসে

এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম।"

এই সময়ে সুবোধ ঘোষ নিয়মিত যেতে শুরু করেন এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি (পূর্বতন ইম্পিরিয়ার লাইব্রেরি)-তে। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন। এ-সবেরই পাশাপাশি তাঁর পরিচিতি ঘটে 'অনামী সংঘ' নামে এক সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে। সেখানকার সেই আড্ডায় গভীরভাবে বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন কবি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল, বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্যদের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে অনেকেই তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তাঁদেরই প্রভাবে গল্প লেখার শুরু। 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল' প্রভৃতি গল্প রচনার পিছনে ছিল অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যদের জোরালো তাগিদ। এই গল্পদুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দনের বন্যা বইতে শুরু করে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় ও 'অগ্রণী'-তে 'ফসিল' প্রকাশ পায়।

'ফসিল' গল্পটিতে শ্রেণি সংঘাত প্রভৃতি বিষয় প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। গল্পটি যখন লেখা হয় তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রাক্‌জনযুদ্ধ পর্যায়ে বামপন্থী আন্দোলন বুদ্ধিজীবী জনঅংশে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছে। 'অনামী সংঘ'-র বামপন্থী অংশের প্রভাব সুবোধ ঘোষের মধ্যে ছায়া বিস্তার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মানুষ উক্ত প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। 'ফসিল' গল্পে তাই বামপন্থী ভাবধারা সর্বোপরি মার্কসীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। ''ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের পটভূমিতে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এক অভিনব রূপায়ণ এই ফসিল।''[২] গল্পের মধ্যে আমরা পাই—'নেটিভ স্টেট' অঞ্জনগড়ের কাহিনি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে পরিকল্পিত প্রয়াসে, আইন নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষিত যুবক মিস্টার মুখার্জী বাঁচিয়ে তোলেন। অঞ্জনগড়ের মাটির নিচের খনিজ সম্পদকে ইজারা দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানির সিন্ডিকেটকে। খনি চালু হল, কুলিরা নতুন নতুন পরিচয়ে উৎসাহের সঙ্গে নগদ পয়সায় খনিতে কাজ করতে লাগল। মুখার্জি অঞ্জনা নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃষিতে গতি আনতে চাইলেন। খেতমজুরের অপ্রতুলতা দেখা দিল। শুরু হল টানাপোড়েন। একদিকে স্টেট অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র অন্যদিকে সিন্ডিকেট অর্থাৎ নব্য ধনতন্ত্র-র দ্বন্দ্বে ও দ্বিমাত্রিক অত্যাচারে শ্রমিকরা আরও অত্যাচারিত হতে লাগল। নব্যধনতন্ত্র নিজের মুনাফা বোঝে, শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তার দায় তাদের নেই। এই বিষয়গুলি নিয়ে মজুর মহল্লাকে সচেতন করার দায়িত্ব নিয়েছিল মরিশাস প্রত্যাগত বৃদ্ধ মজুর দুলাল মাহাতো। ইতিমধ্যে একসঙ্গে এল দুই বিপর্যয়ের দিন। শ্রমিকরা খনির ধসে চাপা পড়ল ও তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম জঙ্গলে কাঠ কাঠতে বাধা দিতে গিয়ে স্টেটের

ফরেস্ট রেঞ্জার গুলি করে মারল অনেক কুর্মি প্রজাদের।

এর মধ্যে প্রজাবিক্ষোভ ঠেকাতে মুখার্জির পরামর্শে বৃদ্ধ দুলাল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়। প্রকাশ পেয়ে যায় স্টেট, সিন্ডিকেট ও পাতিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সমাজের নির্লজ্জ রূপ । লেখক গল্পটিকে শেষ করেছেন এইভাবে—

''লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন একটা জাদুঘরে জ্ঞানবৃক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতকগুলি ফসিল।... অনুমান করছে—তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধ হয় একদিন আকস্মিক কোনো ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখে, শুধু কতগুলি সাদা-সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোনো দাগ নেই।''[৩]

'ফসিল' গল্পটির পাশাপাশি সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পটিও একটি রাজনৈতিক গল্প হিসেবে সাড়া ফেলে। অর্থনীতির এম.এ. সঞ্জয়-এর সুগার মিলে চাকরি নেওয়া শ্রমিক মহল্লায় যাতায়াত রুক্মিনীর প্রেমে পড়া, তার পরিণতিতে রুক্মিনীর গর্ভবতী হওয়া, শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলন পরিকল্পনাকে বিশ্বাসঘাতকের মত মালিকের কাছে ফাঁস করে দিয়ে নিজের 'প্রসপেক্ট' বাড়ানো ইত্যাদি ঘটনা 'গোত্রান্তর' গল্পটির বিষয়। এই গল্পের মধ্যমণি সঞ্জয় যেন 'ফসিল' গল্পের মুখার্জিদের মতোই। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। এই রাজনৈতিক গল্পের লেখক যখন 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাস লিখছেন, তখন তিনি অন্য সুবোধ ঘোষ। আগেই আলোচনা হয়েছে জীবনে কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাই একটা একটা করে কাহিনির প্রেক্ষিত রচনা করেছে। সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতাও উঠে এসেছে তাঁর গল্প উপন্যাসে।

''সুবোধ ঘোষের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এক সময়ের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও এবং সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি প্রথম জীবনে তাঁর কিছুটা আনুগত্য থাকলেও সুবোধ ঘোষ কখনই প্রত্যক্ষভাবে বামপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে তাই যখন 'জনযুদ্ধ' নীতির কথা কমিউনিস্ট মহলে ঘোষিত হল তখন অনেক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের মতোই সুবোধ ঘোষও এই নীতিকে সমর্থন করতে পারেননি।''[৪]

১৯৪০-৪১-এর সময়পর্বে ফ্যাসিবাদের বাড়বাড়ন্তে, বুদ্ধিজীবীমহল দারুন বিপন্নতা অনুভব করে। ১৯৪১-এ সোভিয়েত, জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার বুদ্ধিজীবী জনঅংশ গর্জে ওঠেন। গঠিত হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ', 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট (Y.C.I.)। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েতের প্রতি সংহতি জ্ঞাপনে Y.C.I. বিশেষ সংস্কৃতিক প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এদের এই ''ইনস্টিট্যুট-এর সদস্যরা কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবন নিয়ে অভিনয় করেন 'অঞ্জনগড়' (সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের সুনীল চ্যাটার্জীকৃত নাট্যরূপ) এবং সুনীল চ্যাটার্জী কর্তৃক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজেড নিয়ে রচিত 'কেরানী' নাটক।''[৫]

ফ্যাসিস্ট বিরোধিতায় বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন—১. পরিচয় গোষ্ঠী, ২. অগ্রণী গোষ্ঠী—৩. আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরতদের দ্বারা পরিচালিত 'অনামী চক্র' নামের এক সাহিত্যগোষ্ঠী। সুস্নাত দাশ লিখেছেন—''১৯৪১-এর ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরে 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'অনামী চক্র'র সদস্যদের তীব্র মতবিরোধ ঘটে। সোভিয়েতের পক্ষে কোনো প্রচার তাদের কাগজে করতে দিতে সম্ভবত 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ আর রাজি ছিলেন না, কিংবা কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ নীতিও তাঁরা পছন্দ করেননি। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'অরণি' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।''[৬] মনে রাখতে হবে সুবোধ ঘোষও 'অনামী চক্র' ও সর্বোপরি 'আনন্দবাজার' পত্রিকাভুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতি ঘোষিত হলে সুবোধ ঘোষ কমিউনিস্ট সংস্রব ত্যাগ করেন, কারণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতোই সুবোধ ঘোষও এই 'জনযুদ্ধ' নীতি মেনে নিতে পারেননি। ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা তিনি তাঁর মানসিকতাকে নির্মাণ করেন। ''কমিউনিস্টদের এই জনযুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানরত লেখক শিল্পীদের একত্রিত করতে জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'... এই সংঘের সভাপতি হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় ছিলেন সুবোধ ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ মিত্র।''[৭]

এছাড়া কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অর্থাৎ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতির কারণেও তিনি কমিউনিস্ট সংসর্গ ত্যাগ করেন। ধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' গ্রন্থে 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' ও সজনীকান্ত দাশের 'শনিবারের চিঠি' কতখানি 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'র মানুষদের প্রতি আক্রমণ শাণিত করতো এসব প্রসঙ্গ অবতারণা করে লিখেছেন—''সুবোধ ঘোষ এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'তিলাঞ্জলি' লিখেছিলেন ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে। সুবোধ ঘোষকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে ঠেলে দেওয়ার জন্য মূলত দায়ী ছিলেন নাকি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কিছু অসতর্ক উক্তি এবং অমিত্রসুলভ আচরণ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অন্তত আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। হীরেনবাবুর 'তরী হতে তীর' গ্রন্থেও এই ঘটনার কিঞ্চিত স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ আছে।''[৮]

জনযুদ্ধ নীতিকে সামনে রেখে বুদ্ধিজীবী মহল বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে গেল। 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ', 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট', 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ'-র পাশাপাশি গড়ে উঠল 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'। যুদ্ধ, মন্বন্তর, জনযুদ্ধ নীতি, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেই সুবোধ ঘোষ 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি রচনা করেন। 'তিলাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটির মধ্য আমরা স্পষ্টত তিনটি পরিবার ও দুটি মতাদর্শকে লক্ষ করি। যেমন কাঁকুলিয়া রোডে—অবনীন্দ্রনাথ অরুণাদের বাসা, ডোভার লেনে গুরুদয়াল বসু ও সীতাদের প্রাসাদ এবং বালিগঞ্জ প্লেসে শিশিরের বাড়ি। 'জাগৃতি সংঘ', যা মূলত কমিউনিস্টদের প্রচারক আর অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের কার্যকলাপ—এই দুই মতাদর্শ। উপন্যাসটিতে মূল কাহিনি হিসেবে দাঁড়িয়েছে সীতা-শিশিরের প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বময়তা। প্রকাশবাবু উর্মিলা কাঞ্জিলাল, সীতা বসু এবং জয়ন্ত ইন্দ্রনাথরা মূলত জাগৃতি সংঘের কর্মকর্তা। তাদের নানাবিধ কার্যপ্রণালীর মধ্যে মন্বন্তরের সময় ফাঁকা বুলি আওড়ানো, কালোবাজারিদের কাছ থেকে চাল নিয়ে নিজেদের সংসারের নিরুপদ্রব দিন যাপন করে পাশাপাশি রেশনের লাইনে খবরদারি করে যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার চালায়। সীতা বসুর বাবা গুরুদলায় বসু বিচিত্র রকমের চাল সহযোগে মেয়ের জন্মবর্ষ পালন করে কিন্তু বাইরের ক্ষুধার্ত মানুষের দলকে কুকুরের মতো বিদায় করে। একজন ব্রোকারের মেয়ে এবং সেই ব্রোকারের সহযোগী হয়—কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংঘের কর্মকর্তাদের অন্যতম। প্রকাশবাবু ও উর্মিলার সমাজনীতি উপেক্ষা করে দলনিবেদিত প্রাণ। গ্রামগঞ্জে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকে সংগঠিত করে বিপুল অংশের মানুষকে আত্মসমর্পণ না করে প্রতিরোধের সত্যাগ্রহে সামিল হতে আহ্বান জানায়। সেই কাজে প্রাথমিক পর্বে পাশে পায় শিশিরকে। শিশিরও পরে স্থায়ী সুখের সন্ধানে সীতার টানে জাগৃতি সংঘে নাম লেখায়। পরবর্তী সময়ে ভুল বুঝতে পেরে সরে আসে। অবনীনাথ তার দেশ ও দশের কাজে পাশে পায় বোন জ্যোৎস্নাকে। তার স্ত্রী অরুণাও তাকে সাহায্য করে সাধ্যমতো। শেষ দিকে শিশির, ইন্দ্রনাথ সবাই তাদের বিহ্বলতা কাটিয়ে ভুলকে বুঝতে পেরে কংগ্রেসি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করে। অবনীনাথের কংগ্রেস হয়ে ওঠে এক আশ্রয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪—এই সময়পর্বের যে যে ঘটনা—যেমন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধ' নীতি সবই প্রত্যাশিতভাবে 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে এসেছে। মূলত এই উপন্যাসে কংগ্রেস কর্মী অবনীর উপর লেখকের সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। অবনী সামান্য ব্যাঙ্ক কর্মী। ব্যাঙ্কের চাকরিটাও কালীকিংকর ব্যানার্জী নামক অসাধু

ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে চলে যায়। স্ত্রী, বোন আর পিসিমাকে নিয়ে সংসার চালাতে সে যথেষ্ট হিমশিম খায়। কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে চাল নেয়—''এরই মধ্যে লাইন সমাজে এই প্রশ্নটা নানা রকম গল্প ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে জানে বাবুটি নাকি কোন এক রাজার ছেলে, গরিবের জন্য সব দান করে দিয়েছে। এখন নিজে খেতে পায় না। কেউ বলে—গান্ধী মহাত্মা পাঠিয়েছেন বাবুটিকে। এই চাল পাঠানো হবে গান্ধী মহাত্মার কাছে।... কদাচিৎ দু একজনের অনুমান ও জল্পনায় খানিকটা সত্যের আভাস ফুটে ওঠে—বাবুটি হলেন কংগ্রেসের লোক।''[৯] এরই পাশাপাশি লেখক কমিউনিস্ট পার্টির আশু লক্ষ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রকাশবাবুর মুখ দিয়ে বলেছেন—''জেনে রাখুন আমাদের পার্টির নাম কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টির ভয়ে হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র জাতিবাদী আত্মা দুঃস্বপ্নে আঁতকে উঠছে। জাগৃতি সেই পার্টির একটি বাহু। সব কাজের বড় কাজ, সবচেয়ে প্রথম কাজ—এই পার্টিকে বড় করা।... পার্টির প্রতিষ্ঠার পথে অন্য যে-কোনো দলের প্রভাবকে নৃশংসভাবে, ছলে বলে কৌশলে উপড়ে ফেলতে হবে।''[১০]

দুর্ভিক্ষ পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র কাজ ছিল তার পার্টি সংগঠনকে বড় করা অথবা বিপক্ষ মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা—এই বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ধনঞ্জয় দাশের একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখছেন—''১৯৪৩ সালে বাঙলার মহা দুর্দিনে 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' আর্ত মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিল, সৃজনশীল নানা রচনা—গল্প, কবিতা, নাটক আর গানে গানে মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আশার আলো। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘ শিল্পীদের নিয়ে গঠিত 'ভয়েস অব বেঙ্গল' দল কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, লাহোর, বোম্বে প্রভৃতি শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এই সময় সংগ্রহ করেছিল—এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। আর এই টাকা বাঙলার শিল্পীরা তুলে দিয়েছিলেন 'পিপলস্ রিলিফ কমিটির হাতে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর সেবার জন্য।''[১১]

সুধী প্রধান জানাচ্ছেন, বাঙলার শিল্পীদের 'ভয়েস অব বেঙ্গল' অনুষ্ঠান দেশের নানা প্রান্তে বেশ উন্মাদনা সঞ্চার করে। রাজ্যের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে বাংলার শিল্পীদের অনুষ্ঠান 'বোম্বে ক্রনিকলস্', 'বোম্বে সেন্টিনেল', 'দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকা দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত হয়। নাটক ব্যালে সঙ্গীত সহযোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি বিক্রি প্রভৃতির দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য অর্থসাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, ডি. শান্তারাম, মামা ওয়ারেকার, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ। ১০.১০.১৯৪৩-এর P.W.-কে উদ্ধৃত করে সুধী

প্রধান আরও জানাচ্ছেন যে—''The famous film stars known as Saigal (Mr. K.L. Saigal) to millions of film fans astounded Dehradun by going round with a Jholi by asking for donation to the 5 Lac fond of the Communist Party... He declared that the party's work in the interest of the Indian people had greatly impressed him and he would do this bit to help the party.''।[১২]

এই 'ভয়েস অব বেঙ্গল'-এর দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শচীনশঙ্কর, রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, অবনী দাশগুপ্ত, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, ঊষা দত্ত, শান্তি বর্মণ প্রমুখেরা।[১৩]

পার্টিকে বড়ো করা ছাড়াও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্থসংগ্রহে নেমে পড়া—এই কাজটি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী শাখা হিসেবে 'গণনাট্য সংঘ' ও 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র সদস্যরা সার্থকতার সঙ্গে করেছিলেন।

ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় তৎকালীন কমিউনিস্টদের নানাভাবে কটাক্ষ করেছেন।

কালীকিংকর ব্যানার্জী, কলকাতার একটি চাঁইব্যাঙ্কার 'মর্কট জমির দালাল', কালোবাজারি শিরোমণিকে জাগৃতি সংঘে অনুপ্রবেশ করাতে চেয়েছেন। তৎকালীন যুদ্ধ, মন্তন্বর পর্বে তারা নিস্তার খুঁজেছেন এখানেই।—''উদ্ধারের একটি মাত্র পথ আছে। স্বরূপরাম ও গুরুদয়ালবাবু যেভাবে উদ্ধার পেয়েছেন। কালীকিংকর বাবু ঠিক করলেন, তিনি জনতাবাদী হয়ে যাবেন, তিনি কমিউনিস্ট হবেন। অবনীর জাতীয়তা থেকে বাঁচতে হলে জাগৃতি সংঘের জনতার সঙ্গে এক হয়ে না দাঁড়ালে আর উপায় নেই।''[১৪]

গুরুদয়ালবাবুর কন্যা সীতা কমিউনিস্ট, জয়ন্ত মজুমদারের মতো একজন ব্রোকার সহযোগী এবং কালীকিংকরের মতো একজন অসাধু ব্যবসায়ী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন তার পরিচয় বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী চক্র কমিউনিস্ট সংস্রবে মুক্তি খুঁজছে এরূপ প্রামাণিক তথ্য নেই।

অবনীনাথের স্ত্রী অরুণা যখন অবনীনাথকে জিজ্ঞেস করে যে তারা ২৬ জানুয়ারির সংকল্প পড়েছে কিনা, উত্তরে অবনীনাথ জানায় তাদের সংকল্প পড়া হয়নি কারণ পার্কে পুলিশ আর কমিউনিস্টরা বসে ছিল। তৎকালীন পুলিশের সঙ্গে কমিউনিস্টরা হাত মিলিয়ে

কংগ্রেসের কর্মসূচি ভাঙছে এরূপ কোনো তথ্যও পাওয়া যায়নি।

জাগৃতি সংঘের কার্যপ্রণালীতে মিথ্যাকে লক্ষ করেছে শিশির। সংঘকে সে শ্মশান, খোঁয়াড় ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছে। অবনীনাথ অরুণাকে বলেছে—''জাগৃতি সংঘের নীচতার দাপট দেখে প্রথমেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম অরুণা। আজ আমি এই সংঘকে একটা ছারপোকার বাসা বলেই মনে করি।''[১৫]

শুধু এখানেই শেষ নয়, অবনীনাথ আরও বলেছে—''কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত মানুষ কি করে ঐ সংঘ আর কম্যুনিস্ট পার্টি নামে একটা জোচ্চরের দলের কদর্য ফাজলামির মধ্যে তার মনুষ্যত্বকে মানিয়ে নিতে পারছে, এ রহস্যের কোন হদিস খুঁজে পাই না আমি।''[১৬]

উপরিউক্ত কমিউনিস্ট বিদ্বেষের কোনো হেতু বা কারণ খুঁজে পাননি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ''তিনি (সুবোধ ঘোষ) কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতিকে যে শাণিত বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে কুৎসা রটনা করিয়াছেন তাহার সপক্ষে তিনি কোনো হেতু দেখান নাই। কাজেই পাঠককে ইহা আপ্তবাক্যের ন্যায় মানিয়া লইতে হয়।''[১৭]

অরিন্দম গোস্বামী তাঁর 'সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—''কম্যুনিস্টদের সঙ্গ স্বল্পকালীন নৈকট্য ও পরে আঘাত পেয়ে মেরু পরিবর্তন সম্পর্কে সুবোধ ঘোষ আগাগোড়া নীরব ছিলেন তাই পার্শ্বজনের সাক্ষ্যই আমাদের একমাত্র ভরসা।''[১৮]

এর মধ্যে আমরা কতকগুলি বিষয় আলোচনা করেছি। এখন আমরা কতকগুলি ঘটনাকে লক্ষ রাখব। (ক) সুবোধ ঘোষ তৎকালীন সময়ে 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, চাকরির সূত্রে। সেই ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের বাইরে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। (খ) 'জনযুদ্ধ' নীতির বিরুদ্ধতা, (গ) 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ'-র কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন। সেখানে যুক্ত ছিলেন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায়।

তৎকালীন কমিউনিস্ট সংসর্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অনেকটা আকর্ষিত করেছিল। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে তৎকালীন কমিউনিস্ট কার্যপ্রণালীকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট সংসর্গ ত্যাগ করেন। তারাশঙ্কর লিখছেন—

''কমিউনিস্ট সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এ সত্য আমি কিছুদিনের মধ্যেই

বুঝতে পারলাম। কাছে আসার ফলে তাদের রঙিন আবরণ একে একে তাঁরাই উন্মোচিত করে নগ্ন স্বরূপে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হতে লাগল। প্রথম আঘাতের কথা বলি—এই সংঘের আপিসে একদিন গিয়ে শুনলাম একজন কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গাল দিচ্ছেন—বিভীষণ, কুইসলিং বলে। সেইদিনই বিরোধ শুরু হল। চোখ খুলল। আমি জবাব দিয়ে বাড়ি এলাম।"[১৯]

তৎকালীন কমিউনিস্টদের ইতিবাচক অনেক দিক থাকলেও জাতীয় নেতৃত্বদের সম্পর্কে ওই ধরনের অসংসদীয় উক্তি তৎকালীন সময়ে অনেক লেখককে ব্যথিত করেছিল। সুবোধ ঘোষ তৎকালীন বামপন্থীদের একটা বড় দুর্বলতার দিককেও চিহ্নিত করেছেন। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশবাবুর বিরোধ বেধেছে মাঝে মাঝেই। জাগৃতি সংঘের সভায় ইন্দ্রনাথ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। সেই প্রস্তাবে ইন্দ্র বলে—''কিন্তু নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া যদি এক লড়াই করে শত্রুকে হঠিয়ে দিতে পারে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মানী অভিযান আরম্ভ করে তার নাম 'সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রন্ট'।—সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রন্ট আমরা সমর্থন করি না।"[২০] ইন্দ্রর এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

এই 'জনযুদ্ধ' পর্বে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মিত্রশক্তি অক্ষশক্তি বিষয়ে সংশয় দ্বিধা বিরুদ্ধতা তো ছিলই। কিন্তু মিত্রশক্তির সমর্থকদের মধ্যেও মতবিরোধকেও আমরা লক্ষ করি। ইন্দ্রর ওই প্রস্তাব আনা তাই প্রমাণ করে। এর ঐতিহাসিক সত্যতাও রয়েছে। ধনঞ্জয় দাশ লিখছেন—''ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মূল রণনীতি নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের প্রবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে তাকে অঙ্গীভূত না করার রণকৌশলগত ভ্রান্তির ফলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্তঃসার যথেষ্ট পরিমাণে খর্বিত হয়েছে এবং দেশপ্রেমিক মানুষের এক ব্যাপক অংশ সাময়িকভাবে হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহু সদর্থক প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন।"[২১] উপন্যাস অংশে ইন্দ্রদের সংশয়ও অমূলক নয়।

সুবোধ ঘোষ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল জনৈক নিতাই বসুকে একটি চিঠিতে যা লিখেছেন তা থেকে দুটি অংশকে আলোচনার জন্য তুলতে চাই। (ক) 'কম্যুনিস্ট পার্টির কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা এবং কংগ্রেসের জয়গান' 'তিলাঞ্জলি' সম্পর্কে আপনার মন্তব্যটি রহস্যজনক। ১৯৪২ সালে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যিক ব্রিটিশের সহযোগিতা করেছিল। এটা তথ্য নয়? এবং সে সময় জাতি যে কংগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের জয় চেয়েছিল, সেটাও কি তথ্য নয়।"[২২] (খ) ''গান্ধীপ্রীতি? হ্যাঁ,

আমার যথেষ্ট গান্ধীপ্রীতি আছে। যেমন, আমার বুদ্ধপ্রীতি, বিবেকানন্দপ্রীতি, এমার্সনপ্রীতি আছে। কিন্তু আমি মার্কসবিরোধী নই, যদিও মার্কসের বহু মতে আমি বিশ্বাসী নই। মার্কসের মনীষীর মহত্ত্ব সম্পর্কে আমি একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। আমি মার্কস দর্শনের একজন নিষ্ঠাশীল পাঠক।—গান্ধীপ্রীতি থাকলেই মার্ক্সবিরোধী হতে হয় না।"[২৩] সুবোধ ঘোষের মনোভঙ্গির অনেকখানি ছোঁয়া গেল। তাঁর বিশ্বাসে ধরা পড়েছে তৎকালীন কমিউনিস্টদের ব্রিটিশ সহযোগিতা এবং তৎকালীন কংগ্রেসের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা। এই দুটি পরস্পরবিরোধী দিক সুবোধ ঘোষ তুলে ধরেছেন। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য কারণের যথেষ্ট অভাব লক্ষ করা গেছে। সঙ্গত কারণেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—''সমস্ত আলোচনাটি সাহিত্য অপেক্ষা প্রচারকার্যে সমধর্মী বলিয়া ঠেকে। জাগৃতি সংঘের আদর্শ অনুসরণ যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ তাহাই ঘোষণা করিবার অতিরিক্ত ব্যগ্রতাতেই লেখক মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন। সাহিত্যকে সাংবাদিকতার স্তরে নামাইলে উহার যে মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী এখানে তাহাই ঘটিয়াছে।"[২৪]

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসের সদর্থক ভূমিকার প্রচার তৎকালীন 'কংগ্রেস সাহিত্য সমিতি'-র অন্যতম কাজ ছিল। তাই সেই সমিতির সভ্য সুবোধ ঘোষের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি তাই জনৈক ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বলেছেন—''আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সুহৃদ। কংগ্রেসের মর্যাদা রাখতেন আপনারা। কংগ্রেসকে ভুলবেন না, ভুল বুঝবেন না। আপনারা মহৎ হলে কংগ্রেস মহৎ হবে। কংগ্রেস মহৎ হলে আপনারা মহৎ হবেন। আপনারাই কংগ্রেস। কংগ্রেস কোনো পার্টি নয়, দল নয়, আশ্রয় নয়। কংগ্রেস মানুষের ইতিহাসের ইঙ্গিত পথ ও পরিণাম।[২৫] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সূত্র ধরেই বলা যায় সুবোধ ঘোষ 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় যেন 'কংগ্রেস সাহিত্য সমিতির' ইশতেহার রচনা করেছেন।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের দুর্দশা বর্ণনাতে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এখানেই সার্থক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাবনা। বিপিনের ছেলে টুনার দুর্ভিক্ষপীড়িত ছবি নিপুন দক্ষতায় তুলে ধরেছেন লেখক। চোখ বুজে কল্পনা করলে জয়নাল আবেদিনের চিত্র আমাদের সম্মুখে ভেসে উঠবে। ''পুনি কেওটানী ভিক্ষে করছিল। টুনার এই জীর্ণ মানবীয় আকৃতিটাই পুনির উপজীবিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়, টুনার শরীরটা পুনির একটা ভিক্ষাপাত্র মাত্র—পথিকের হাতের কাছে তুলে ধরছে, চোখের সামনে দুলিয়ে দিচ্ছে কখনো বা পায়ের কাছে মাটিতে পেতে দিচ্ছে।"[২৬]

এছাড়া গুরুদয়াল বসুর কন্যা সীতা বসুর জন্মদিনে বিভিন্ন আয়োজনের পাশে

দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বেমানান উপস্থিতি এবং দারোয়ান কর্তৃক তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার নির্মম দৃশ্য বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা।

এই উপন্যাসের পরিণতিতে আমরা লক্ষ করেছি যারা ভুল বুঝে কংগ্রেস ত্যাগ করে কমিউনিস্ট শিবিরে ভিড়েছিল, কমিউনিস্টদের কাজকর্মে হতাশ হয়ে ভুল বুঝে তারা আবার কংগ্রেসের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। যেমন—ইন্দ্রনাথ, শিশির প্রমুখ। উদ্দেশ্যমূলক পরিণতি হলেও চমৎকারীত্য সৃষ্টিতে লেখক সক্ষম হয়েছেন বলা যায়।

দুর্ভিক্ষের চিত্রসকল, সীতা শিশিরের প্রেম পরিণতিতে ঢাকা পড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবোধ ঘোষ ''রোমান্টিক মন নিয়েই 'তিলাঞ্জলি'তে দারুণ আকালে গুরুদয়ালের রকমারি চালের ভাতের বিলাসের পটভূমিতে টুনা বিপিন প্রভৃতির নিদারুণ দুর্দশার দলিল হাজির করেন বটে, কিন্তু সীতার মনের গূঢ় জটিল অলিগলি সব হারিয়ে যায়।''[২৭]

ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ একজন কংগ্রেস কর্মীকে যতখানি সহনশীল, সংবেদনশীল, গরিব দরদী করে আঁকা যায় তিনি এঁকেছেন। সেখানে আপন আবেগের কাছে যুক্তিপরাভব স্বীকার করেছে। ''সাঁইত্রিশ সালেই কিষাণ সভার নেতৃত্বে চালিত আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসীদের যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল; চল্লিশ সালে বাংলাদেশের নানা জেলায় কৃষকসভার আন্দোলনের ধারায় জমিদার ও বড় চাষিদের টনক নড়েছিল।''[২৮] সেই ধারা বেয়েই বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী কালের তেভাগার সংগ্রাম। আমরা বাস্তবে পেয়েছিলাম কংসারী হালদারদের মতো কৃষকনেতাদের চন্দনপিঁড়ির অহল্যা মায়েদের আর সাহিত্যে পেয়েছিলাম ভুবন মণ্ডল (হারানের নাতজামাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-দের। দুর্ভিক্ষের পরবর্তী পর্বে জমির লড়াই-এ পীড়িতবর্গ অংশগ্রহণ করেছিল তৎকালীন কৃষকসভার নেতৃত্বে এর ঐতিহাসিক সত্যতা আছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, তৎকালীন কংগ্রেসের আন্দোলনের অনেক সদর্থক দিক ছিল। তার সেই পর্বে ফ্যাসি-বিরোধিতাই ছিল কিন্তু 'জনযুদ্ধ' নীতির বিরুদ্ধে। সোভিয়েতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের অনেকটা অংশ সেসব বিষয়গুলিও সুবোধ ঘোষ বিভিন্নভাবে 'তিলাঞ্জলি'তে লিখেছেন। তবে রূপান্তরিত মানসিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং পারিপার্শ্বিক বন্ধুত্ব, প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সংগঠনগত বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি 'তিলাঞ্জলি'তে রক্ষা করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. ঘোষ, সাগরময়, *সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র*, ভূমিকা অংশ, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

২. ঘোষ, সত্তম (স.), *সুবোধ ঘোষের বাছাই গল্প*, ভূমিকা অংশ, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৪১২ ব.

৩. তদেব, পৃ. ১০৪

৪. গোস্বামী, অরিন্দম, *সুবোধ ঘোষ: কথাসাহিত্য*, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৩

৫. দাশ, সুস্নাত, *ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে অবিভক্ত বাংলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৯

৬. তদেব

৭. গোস্বামী, অরিন্দম, *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৩-৪৪

৮. দাশ, ধনঞ্জয় (স.) *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩১

৯. ঘোষ, উত্তম ও নাথ, সমীরকুমার (স.), *সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২০৮

১০. তদেব, পৃ. ২১৬

১১. দাশ, ধনঞ্জয়, *মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১

১২. Pradhan, Sudhi (Ed.), *Marxist Cultural Movement in India*, Pustak Bipani, Calcutta, 1985, p. 248

১৩. তদেব

১৪. ঘোষ, সুবোধ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯

১৫. তদেব, পৃ. ৩০৮

১৬. তদেব

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. কলকাতা, ২০০৬-০৭, পৃ. ৬৫৫

১৮. গোস্বামী, অরিন্দম, *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৮

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *শিল্পীর স্বাধীনতা*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অগ্রন্থিত রচনাবলী*, বারিদবরণ ঘোষ (স.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১৬ ব., কোলকাতা, পৃ. ১৬১

২০. *সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২১. *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২২. *সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪

২৩. তদেব

২৪. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৫

২৫. *সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

২৬. তদেব

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'সময়ের ডমরু ও বাংলা উপন্যাস', *বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসীয় চেতনার ধারা*, ধনঞ্জয় দাশ (স.), অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃ. ৯৪

২৮. তদেব, পৃ. ৯৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

- **সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী** (১৩৬২ ব.)
- **মন্দ্র-মুখর** (১৩৫২ ব.)
- **সূর্য-সারথী** (১৩৫২ ব.)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মসাল নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন ১৯১৭। কিন্তু অধিকাংশ জনই মনে করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মেছেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে (বাঙালি চরিতাবিধান, ঢাকা)। লেখক নিজেই লিখেছেন তাঁর ''জন্ম ১৩২৫ সালে।''[১] স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙি গ্রামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতৃপ্রদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ''নারায়ণ নামটি সম্ভবত তাঁর দিদিমার রাখা, তিনি সাহিত্য রচনায় যুক্ত হবার পরেই নারায়ণ নামটি ব্যবহার করতে থাকেন।''[২] পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজ আমলের পুলিশ আধিকারিক। নাজিপুর থানার ও.সি. থাকাকালীন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। নাজিপুর স্কুলেই প্রাথমিক পাঠ শেষ করে দিনাজপুর জেলাস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারপর ফরিদপুরের রামেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৩৬-এ আই.এ. পাশ করেন, পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন সহ বি.এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১-এ বাংলায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন, তারপর কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন।

পিতা ইংরেজ সরকারের পুলিশ আধিকারিক হলেও, সেই শাসন আনুগত্যের কোনোরূপ প্রভাব সন্তানদের মধ্যে পড়েনি বা পড়তে দেননি। ফরিদপুরে রামেন্দ্র কলেজে পাঠকালেই নারায়ণ স্বাদেশিকতাবোধে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হন। তাঁর উল্লেখেই আমরা

দেখি তিনি লিখেছেন—''ছোটবেলাতেই আমি রাজনীতিতে যোগ দিই... আমার বাবা আশ্চর্য একটি মানুষ। এসব তিনি জানতেন কিন্তু কখনও আমাকে বারণ করেননি।''[৩] এই স্বাদেশিকতাবোধ তাঁকে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে উৎসাহিত করে। কমিউনিজম্-এর কাছাকাছি আসার জন্য যে মানুষটির প্রভাব ছিল তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেজদা শেখর গাঙ্গুলি। রাজনীতির কারণেই শেখর গাঙ্গুলি পুলিশের কবল থেকে উধাও হয়ে যান। তাঁকে অনেকদিন দেখাও যায়নি। উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী কর্মে অংশ নিয়ে জেলে যান। অত্যাচার সহ্য করেও যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। পরবর্তীকালে বিহারের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশ নেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছাকাছি আসা অথবা লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা ইত্যাদিতে অগ্রজের প্রভাব আছে বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কমিউনিস্ট দলের সভ্য ছিলেন না, অনুরাগী ছিলেন। সিটি কলেজের এক তাত্ত্বিক সহকর্মী সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষ্যে জানা যায়—''নারায়ণবাবু কার্ড হোল্ডার কমিউনিস্ট না হলেও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিলেন। ফলে সহজেই তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন অল্প সময়েই। ...পার্টিম্যান হলে যে গোঁড়ামি ও মতান্ধতা প্রায়ই প্রগলভ হয়ে ওঠে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচ্যুতি ও বিকৃতিকে সমর্থনের প্রবণতা দেখা দেয়, পার্টিম্যান না হওয়ায় নারায়ণবাবুর তা ছিল না। স্বাধীনচিত্ততা তিনি অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছিলেন।''[৪]

সাহিত্যরচনায় পূর্বসূরী হিসাবে পেয়েছেন, কল্লোল যুগের কিছু সাহিত্যিক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে। সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিকগণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন—''তিনি যখন সাহিত্য রচনায় নেমেছেন তখন—তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, মানিকের জীবনবোধ শিল্পকৌশলের উত্তরসূরী হয়েই তিনি এসেছেন। তার উপর বিংশ শতকের বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও গল্প লেখকদের জীবনদৃষ্টি ও কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তাঁকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছে।''[৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্কর দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। তাঁর কথাসাহিত্যে সামন্তশ্রেণির ইতিহাস, নব্য তথা ভাবীকালের আবাহন, ইতিহাসের গতিধারা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ছাপ ফেলেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তারাশঙ্কর প্রীতি বিষয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—''নারায়ণের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কারণ,

আমরা দু-জনেই তারাশঙ্করের ভক্ত। নারাণ ছিল তারাশঙ্করের যোগ্য উত্তরসূরী।"[৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখায় তারাশঙ্করের সামন্তসমাজ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন একটি গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন—তা হল নিম্নবর্গ সমাজ। এই জায়গাতেই তারাশঙ্করের মনোভঙ্গীর সঙ্গে নারায়ণের মনোভঙ্গীর পার্থক্যরেখা চিহ্নিত হয়ে যায়। —''তারাশঙ্কর মূলত গান্ধীবাদী, আর নারয়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিতর্ক সত্ত্বেও মার্কসীয় চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী।"[৭]

এই মার্কসীয় মনোভঙ্গী থেকে যদি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসকে আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখব সেখানে মার্কসীয় দলীয় পন্থা নেপথ্যে থেকে কীভাবে নিপীড়িত সমাজের বেঁচে থাকার লড়াই সামনে এসেছে। এ-রকম তিনটি উপন্যাসকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল—(১) সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (ফাল্গুন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), (২) মন্দ্র-মুখর (চৈত্র, ১৩৫২), (৩) সূর্য-সারথি (১৯৫৩)।

■ সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকাল ১ ফাল্গুন, ১৩৫২। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত প্রান্তরের এক বিশেষ জনপদজীবন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসের বিষয়ভিত্তি হয়েছে। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত—(ক) কথামুখ, (খ) কথারম্ভ, (গ) কথাশেষ। ইতিহাসের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই তিনটি অংশে।

'কথামুখ' অংশে ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার একটা অংশ উঠে এসেছে। জমিদারতন্ত্রের সূচনা, তার প্রভাব কমে গিয়ে বর্তমানের হতশ্রী দশা সবই এই অংশে বর্ণিত। ''বক্তিয়ার খিলজির সপ্তদশ অশ্বারোহীর সঙ্গে মুসলমান রাজতন্ত্রের যে প্রবল বন্যা এসেছিল, তার খরপ্রবাহে একদিন দেবীকোট রাজবংশও গেল তলিয়ে। দেবীকোটের নাম হল ঘোড়াঘাট আর ঘোড়াঘাট সরকারের শাসনে উত্তরবঙ্গের একটা বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। প্রাচীন রাজবংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলে, যারা এত সহজেই ধর্মটাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, তাদের একটি শাখা এখানে এসে জমিদারদের একটা খণ্ড অংশ নিয়েই খুশি হয়ে গেল। এরাই রায়বর্মাদের পূর্বপুরুষ।"[৮] এই রায়বর্মাদের শেষ কুলপ্রদীপ কুমার বিশ্বনাথ। ''কুপ্রদীপ কথাটাও সমান অর্থেই সত্য, কারণ জমিদারির অবশিষ্ট যেটুকু আছে কুমার বিশ্বনাথের বিলাসের মশাল হিসাবে আর বছর কয়েকের মধ্যেই তা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর বিস্মৃতির অন্ধকার।"[৯] পুরনো

সাতমহলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। নহবৎখানার ভিতরে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে, পিলখানার পাথরের থামগুলোতেও উঠেছে উইয়ের ঢিবি, অন্দরের দিঘিতে মানুষের সমান উঁচু কচুরিপানা। তবুও কুমার বিশ্বনাথের আমলে জগদ্ধাত্রী পুজোয় কলকাতার সেরা যাত্রার দল, খ্যামটা, কোনো বার থিয়েটারের আমদানী হয় পর্যন্ত। একেবারে তারাশঙ্করের 'জলসাঘর'-এর বর্ণনার কথা মনে পড়ে যায়। এই মজে যাওয়া হতশ্রী কুমারদহকে লালা হরিশরণ তার ব্যবসার শ্রীক্ষেত্র বানাতে চান। ব্যবসার উপযুক্ত জায়গা বিবেচনা করে এখানেই লালাজি তার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মন স্থির করেন। এখানে মটর চালাবার মত উপযুক্ত রাস্তা নির্মাণ করে মৃতপ্রায় কুমারদহে যান্ত্রিকভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ধ্বনিত হয়—''ব্যবসাকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে, বড়, বড়, আরও বড়। পৃথিবী ব্যাপী ঈশ্বর্যের যে খরস্রোত বয়ে চলেছে, তার তীরে কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই চলবে না।"[১০] একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, অন্যদিকে নব্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিভু লালা হরিশরণের দ্বন্দ্ব প্রকটরূপ দেখানোতেই শেষ হয়ে যায়নি উপন্যাসটি। শিক্ষিতা রাজনীতিসচেতন অপর্ণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উপন্যাসটিতে অন্য মাত্রা যুক্ত করতে চেয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যেখানে সূচিত হয়েছে তারাশঙ্করের স্টাইলের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্টাইলের পার্থক্যরেখা।

অপর্ণার বাবা ছিলেন এক রাজনৈতিক কর্মী। তাঁরই আদর্শে অপর্ণা গড়ে উঠেছেন। অপর্ণার ''ছেলেবেলা থেকে চোখের সামনে শুধু জেগেছিল দেশ সেবার একটা সুমহৎ স্বপ্ন।"[১১] সেই স্বপ্নের প্রেরণাতেই আই.এ. পড়বার সময় তাঁকে তিন বছরের জন্য কারাবাস করতে হয়। ''অদ্ভুত একটা অবস্থাচক্রে তিনি কুলবধূ হয়েছেন রায়বর্মাদের।"[১২] স্বামী বিশ্বনাথের ব্যভিচার দেখেও অপর্ণা কোনো অভিযোগ করেননি। অন্তঃপুরে গ্রন্থসমূহের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন। পড়াশুনার তালিকায় লাল মলাটের মার্কসের বইও ছিল। অনুভব করেছেন ইতিহাসের অনিবার্য পরিণামে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাই সে সর্বস্ব খোয়ানো বিশ্বনাথকে বলেছে—''এ যুগ লালা হরিশরণের, কোনো অস্ত্র কোনো রাজার ক্ষমতা নেই তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারদিকে তারা মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করেছে প্রজাকে।"[১৩]

লালা হরিশরণরা ক্রমশ হারিয়ে দিচ্ছে সামন্ততন্ত্রকে। সে মনে করেছে ''কুমারদহকে ধ্বংস করতে হবে—দেবীকোট রাজবংশকে লুটিয়ে দিতে হবে ধুলোর নিচে।"[১৪] ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের মুছে দিতেই তার যাবতীয় উৎসাহ। লালা হরিশরণ অনেকটা সফলও হয়েছে। কিন্তু তার শেষ প্রতিদ্বন্দ্বী অপর্ণা তাকে জিততে দেয়নি। মানুষের প্রতি বিশ্বাসের

ভিত্তি রচনা করে মানুষের মাঝে নেমে এসে লালা হরিশরণদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস-রাজরাজারা ব্যবসায়ী তৈরি করে না, ইতিহাস তৈরি করে মানুষ—সব অংশের মানুষ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—''জমিদার প্রজার সংঘাত ধনী-শ্রমিকের সংঘাতে রূপান্তরিত হইয়া এক নতুন রণনীতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।''[১৫] এই নতুন রাজনীতির অগ্রগামী ধ্বজা বহন করেছে অপর্ণা। অপর্ণার বহিঃরঙ্গ প্রকাশে লেখক একটা বিশেষ রাজনৈতিক আভাস নিক্ষেপ করেছেন। যেমন—''অপর্ণার পরণে টকটকে লাল গাঢ় রঙের শাড়ি। কানের বালাদুটোতেও দুখণ্ড লাল পাথর ঝুলছে—সবটা মিলে যেন অপূর্ব আগ্নেয় সৌন্দর্য একটা।''[১৬]

এই বিপ্লবীরূপ নিয়েই লালাজির সামনে দাঁড়িয়েছে অপর্ণা। এ অপর্ণা অন্তরালবর্তিনী অপর্ণা নন, এ অপর্ণা—''পার্টি অফিসের অপর্ণা, ভুখ মিছিলের অপর্ণা।''[১৭] এই অপর্ণাই শিখিয়েছে জমিদার তার সাতমহলা ত্যাগ করে জমিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের কাছে নেমে আসতে তাহলে তারাই তাঁকে রক্ষা করবে। একটা মার্কসীয় মতাদর্শের আভাস আছে কিন্তু তা রয়েছে মধ্যবিত্ত ভাববিলাসিতার মধ্যে। কোনো অ্যাকশন নেই। শুধু কিছু রোমান্টিক বিপ্লবী বাতাবরণ আছে। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কসীয় ধারণাকে কখনো অনুশীলনের স্তরে নিয়ে আসেননি তাই এরকম অমার্কসীয় চিন্তার বিস্তার লক্ষ করা গেছে।

■ মন্দ্র-মুখর

'মন্দ্র-মুখর উপন্যাসটি ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি লেখক সেজদা শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। আগেই আলোচিত হয়েছে লেখক এই বিপ্লবী সেজদারই অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ হন।

উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত নগর এই উপন্যাসটির পটভূমি। একটি ছোটো শাখানদী শহরটিকে দু-ভাগ করেছে। শহরের সে-রকম কোনো কৌলিন্য নেই, ছোটো ছোটো টিনের ঘরবাড়ি কিছু কোটাবাড়ি, সরু খোয়াওঠা রাস্তা, নর্দমার অবস্থাও ভালো নয়। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্লাব, লাইব্রেরি সমৃদ্ধ নিশ্চিন্ত নগরেই বাস করেন পূর্ণবাবুর মতো উকিল, স্কুল শিক্ষক রমাপদবাবু, কালিসদন মোক্তাররা। নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রতীক নিয়েই আছেন এই শহরের লেডি ডাক্তার এডিথ। তিনি তাঁর সামর্থ মতো সেবাকার্য চালিয়ে যান। মহিলা সমিতি তারা তাদের নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে শহর মাতিয়ে রাখে।

রাজনৈতিক আলোড়ন আড্ডাপ্রিয় নিশ্চিন্ত নগরকে আর নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়নি। ''সমস্ত শহরটা যেন থমথম করছে। মিটিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপকভাবে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সভার সমস্ত উদ্যোক্তাদের।... পুলিশ সার্চ করে বেড়াচ্ছে শহরের বাড়িঘর। কয়েকটি আপত্তিকর ছেলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।''[১৮] শহরের পথঘাটে হাজার হাজার যুবক 'চিৎকার করছে', 'বন্দেমাতরম্ মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলে।

ভাতারমারির মাঠ আর এক ইতিহাস রচনা করতে চলেছে। মুক্তি পিপাসী নেংটি সার মানুষও কাতারে কাতারে সামিল হয়েছে সেখানে। সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে জনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।—''প্রসারিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আগামী কালকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে''[১৯] যারা তাদের মধ্য বিপ্লবী প্রভাস অন্যতম। সে রেখা সান্যাল ওরফে এডিথের বাহুপাশ ত্যাগ করে ভাতারমারির মাঠের গণসংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে যাবে। সে সেই সংগ্রামী জনতাকে বার্তা দেবে—''বিপ্লবের প্রদীপকে নিবিয়ো না—বুকের রক্ত দিয়ে জ্বালিয়ে রাখো—ঐক্যবদ্ধ হও—শক্তি অর্জন করো। আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়—গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।[২০] এই স্বপ্ন আত্মপ্রত্যয় আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বাক্ষর রেখে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। উপন্যাসের শেষেও লেখক রেখে গেছেন রক্তিম স্বাক্ষর—''পশ্চিম প্রান্তে রক্তরঙিন দিনান্ত। আকাশ যেন লাল চাঁদমণ্ডলের বুলেট বেঁধা বুকের রক্তে লাল।''[২১]

একটি শহর উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি। তারই একটি অংশ ভাতারমারীর মাঠের গণসংগ্রাম কাহিনি ক্লাইম্যাক্স নির্মাণ করেছে। মানুষের গণসংগ্রামই উপসংহার। অগ্নিশিখার প্রজ্জ্বলনে মানুষ উদ্ভাসিত। ব্যক্তিমানুষ প্রভাসরা এসেছে গেছে। কিন্তু সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর রয়ে গেছে, সমালোচক সংগত কারণেই বলেছেন—''উপন্যাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হলো হাজার হাজার বছর ধরে নিরক্ষর থাকা, ক্ষুধার্ত, শোষিত মানুষের একত্র হবার ব্যাপারটি এবং শিল্পী তাদের মধ্যেই দেখেছেন নবযুগের চেতনার আলো।''[২২] এই উপন্যাসটিতে সরাসরি মার্কসীয় মতাদর্শের কথা নেই। কোনো চরিত্রও সরাসরি কমিউনিস্ট নয়। কিন্তু গণসংগ্রামের যে রূপ আমরা দেখলাম, নবযুগের যে স্বাক্ষর আঁকা হলো তাতে প্রচ্ছন্নভাবে মার্কসীয় মনোভঙ্গীকেই ইঙ্গিত করেছে বলেই মনে হয়।

■ সূর্য-সারথি

'সূর্য-সারথী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে, বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। এই উপন্যাসটির ঘটনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। পটভূমি রয়েছে দুটি—এক. কোলকাতা,

দুই. ডুয়ার্স-এর চা বাগান অঞ্চল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে নগর কলকাতা জাপানি বোমার আতঙ্কে ভুগছিল। শহর থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রাণরক্ষার তাগিদে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ। এই সুযোগে সুমিতারা একটা চারতলা বাড়ি বিনা ভাড়াতেই পেয়ে যায়। সেখানে আশ্রয় নেয় সুমিতা, কবি ইন্দু প্রমুখরা। মণিকাদি ডাক্তার, তিনি সুমিতাদের অভিভাবিকা। ওই চারতলা বাড়ি থেকেই সূর্য-সারথির দল তারা তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করে। এই কাহিনির পাশাপাশি আর একটি কাহিনি যা এই উপন্যাসের মূল কাহিনি তা প্রসারিত হয়েছে ডুয়ার্স-এর চা বাগান পর্যন্ত। অনিমেষ ছাত্রজীবনে কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল। তার উপরেই ভার পড়েছে চা বাগানে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার। কারণ অনিমেষরা মনে করে—''ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যতম চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে চা বাগান। সেখানে এখনও আফ্রিকার আদর্শে রাজ্যপাট চলছে। সেখানে শ্রমের দাম নামমাত্র। জীবনের দামও প্রায় তাই।''[২৩] অনিমেষ রবার্টস-এর চা বাগানে চাকরি নিল। রবার্টস শোষক ইংরেজের প্রতিনিধি। প্রচণ্ড অত্যাচারী। তার কথার বাইরে কোনো শ্রমিক চললে তার পরিণতিও হয় ভয়ঙ্কর। সেই অত্যাচারিত অবহেলিত মানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের অগ্নিশলাকা এঁকে দিতে অনিমেষ এখানে এসেছে।—''এদের মধ্যে হঠাৎ এসেছিল অনিমেষ, এসেছিল একটা নতুন পৃথিবীর খবর নিয়ে। কোথাও নাকি এমন একটা দেশ আছে যেখানে মালিক বলে কেউ নাই, যেখানে কথায় কথায় বুকে পিঠে লাথি এসে পড়ে না। যেখানে খাটুনি কম মজুরি বেশি। যেখানে ওরা সব, ওদেরই সব।''[২৪] এই সাম্যভাবনায় ভাবিত অনিমেষ কোন রাজনৈতিক বার্তাকে বহন করে আনছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে সাম্যচেতনার কথা পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে উহ্য তা এই সূর্য-সারথিতে স্পষ্ট। চা শ্রমিকরা এই অনিমেষের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করলে অত্যাচারি রবার্টস প্রথমেই আন্দোলনের নেতা অনিমেষকে প্রচণ্ড মারে জখম করে রাস্তায় ফেলে দেয়। বাকিদেরও কপালে জোটে দুর্ভোগ। শ্রমিকরা কিন্তু তাদের প্রিয় নেতা অনিমেষ ব্যানার্জিকে ফেলে চলে যায়নি।—''তারা ব্যানার্জিবাবুকে কখনও জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে পারে না। তাঁকে বাঁচাতে তাঁকে লুকিয়ে রাখবে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন এখনও মুছে যায়নি মন থেকে।''[২৫] শ্রমিক মজুর আর কেউ বসে থাকল না, ওরা বদলা নিতে চায়, মরচে পড়া অস্ত্রে এবার ওরা শান দেবে। রবার্টকে প্রাণে মেরে তারা তাদের অত্যাচারের বদলা নিল। আদিত্য অনিমেষের সহকর্মী, সে জেলে গেল, অনিমেষ সুমিতার কাছে আশ্রয় নিলেও পুলিশ থেকে রেহাই পেল না। হংসমিথুনের নীড় খোঁজা কবি ইন্দুও ইতিহাস হয়ে রয়ে গেল।

উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে মার্কসীয় মতাদর্শের বিভিন্ন কথা। শশাঙ্ক লীলা, অনিমেষ সুমিতার ব্যর্থ প্রেম কাহিনির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক বিপ্লবী ধারণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়টিকেই অনিমেষরা একটি ইতিবাচক সময় বলে মনে করেছে। সে বলেছে—''যুদ্ধের সময় পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ভয়চকিত হয়ে যেন অপমৃত্যুর প্রহর গুনছে। আমাদের যা করবার তা করতে হবে এখনই। হাতে হাত মেলাও ভাই কাঁধে কাঁধ মেলাও। আদায় করে নাও যা তোমার পাওনা, কলকারখানার হাতুড়িকে, ধানের ক্ষেতের কাস্তের মুখে প্রতিষ্ঠা করো তোমার দাবিদাওয়াকে।''[২৬]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসে এত স্পষ্ট করে বামপন্থী চেতনা ব্যক্ত হয়নি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কসবাদে আস্থা রাখেন কিন্তু তাঁর মধ্যেও একটা দ্বিধা দেখা যায়। তাঁর উপন্যাসের নায়করা প্রধানত মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণিচিন্তায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আকৃষ্ট ছিলেন। ''আর এমন বোধের জন্যই তাঁর মধ্যবিত্ত নেতারা জনগণের কাছে যেতে চাইলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রদের মতো মানসিকতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতাদের নেই।''[২৭] নাজমা জেসমিন চৌধুরীর এই মতকে সমর্থন করেও বলা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দলভুক্ত কমিউনিস্ট ছিলেন না। তাঁর মতাদর্শের প্রতি অনুরাগ আর বিশ্বাস থেকে যেটুকু প্রকাশ করা দরকার তিনি তাই করেছেন।

'সূর্য-সারথি' উপন্যাসে লেখক সশস্ত্র বিপ্লবের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদিও এই উপন্যাসের নায়ক অনিমেষ ভেবেছে, যে সংগ্রামের গণভিত্তি চা বাগানে রচনা করেছে তাকে সে নিষ্ফল হতে দেবে না। সে বলেছে—''কেন পালিয়ে আসব চোরের মতো, খুনির মতো? বরং যারা খুন করেছে তাদের এখন এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা দরকার, তাদের বোঝানো দরকার—শক্তিকে অপচয় করবার কোনো সার্থকতা নেই, আসন্ন আগামী বিপ্লবের জনতাকে সংযত করতে হবে।''[২৮]

একথা অনিমেষ বললেও 'মন্দ্র-মুখর' উপন্যাসে ভাতারমারির মাঠে যে গণসংগ্রামের ভিত্তিভূমি আমরা রচিত হতে দেখেছি, আর তা একবার উত্তরবঙ্গের আর এক প্রান্তে চা বাগানে ছড়িয়ে যেতে দেখলাম। রবার্টস খুন হবার পর লেখক লিখেছেন—''রবার্টসকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু শুধু রবার্টস নয়—এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটা প্রবল ও প্রকাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। অপমানিত মানুষের রক্তে রক্তে সাড়া উঠেছে—শ্রেণিসংগ্রামের সাড়া। বিপ্লবের লাল ঘোড়া দিগন্তের আকাশে ঝোড়ো মেঘের কেশর ফুলিয়েছে। এখন থেকে এর প্রতিবিধান না করলে কল্পনাতীত পরিণাম অপ্রত্যাশিত নয়।''[২৯] এই অত্যাচারিত মানুষের

সংগঠিত আন্দোলন থেমে থাকেনি। শ্রেণিসংঘাতের প্রকৃতি যে ভাতারমারির মাঠে, ডুয়ার্সের চা বাগানে সংঘটিত হয়েছে তা আবার ছড়িয়ে পড়েছে নকশালবাড়ির সংগ্রামী মানুষের কাছে। যার কথাভাষ্য, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, তপোবিজয় ঘোষ, শৈবাল মিত্রদের লেখায় ফুটে উঠতে দেখেছি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. 'আমার কথা', *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১৯

২. রায়চৌধুরী, প্রভাস, *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ১১

৩. *সমগ্র কিশোর সাহিত্য*, চতুর্থ খণ্ড 'ছোটোবেলার স্মৃতি' (আত্মজীবনী), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ১৩৪-৩৫

৪. মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পদসঞ্চার*, লেখক পরিচিতি, রত্নাবলী, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ৮-৯

৫. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, পৃ. ২৬৪

৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ, 'অন্তরঙ্গতম আত্মীয় নারায়ণ', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০ নভেম্বর, ১৯৭০

৭. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, কলকাতা, পৃ. ৪০

৮. *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ২৭৮

৯. তদেব, পৃ. ২৭৯

১০. তদেব, পৃ. ২৮৯

১১. তদেব, পৃ. ৩১৭

১২. তদেব

১৩. তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৪. তদেব, পৃ. ৩৩৪

১৫. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ৬৩১

১৬. *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১

১৭. তদেব, পৃ. ৩৪০

১৮. *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১২১

১৯. তদেব, পৃ. ১৩০

২০. তদেব, পৃ. ১৩৩

২১. তদেব, পৃ. ১৩৪

২২. *জীবন উপনিবেশের দ্রষ্টা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, কলকাতা, পৃ. ৭৩

২৩. *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ১৬৬

২৪. তদেব, পৃ. ১৯১

২৫. তদেব, পৃ. ১৯৫

২৬. তদেব, পৃ. ১৭৫

২৭. চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ২১৩

২৮. *নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২৯. ঐ, পৃ. ২১১

সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫)

■ সৃজন (১৯৪৬)

বাংলা কথাসাহিত্যে মহিলা কথাকার হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ''শিক্ষাদীক্ষার অভিন্নতা, অবাধ সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ও পূর্বতন জীবনযাত্রা পদ্ধতির রূপান্তর এই পরিণতি সাধনে সহায়তা করিয়াছে।''[১] পরিবার জীবনের নতুন নতুন সমস্যা, যৌথ পরিবারের আদর্শ-অবলুপ্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক ঈর্ষা, ক্ষোভ, পুরুষের ঔদাসিন্য ইত্যাদি বিষয় নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের বিষয়ভিত্তি হয়েছে। অতীতের ভাববিলাসিতা কাটিয়ে নারী ঔপন্যাসিকরা উপরিউক্ত বিষয়ে নজর দিচ্ছেন। সমাজের একটি ছোট্ট একক পরিবার, তার সমস্যা থেকে নারী ঔপন্যাসিকরা বেরিয়ে এসে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সমাজকে দেখেছেন। ''স্ত্রী-ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রগতিশীলতার সহিত অতীতমুখীনতার বাস্তবানুসরণের সহিত বস্তু অতীত ভাব প্রেরণার এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়।''[২] তা সত্ত্বেও তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ উৎপাদনের সামাজিক অধিকারের নিরিখে যে সামাজিক বিন্যাস নির্মাণের স্বপ্ন নিয়েও উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদেরই অন্যতম একজন সাবিত্রী রায়।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল অধুনা বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গার কোলে ঢাকা শহরের উয়াড়িপল্লীতে লেখিকা সাবিত্রী রায়ের জন্ম। পিতা নলিনীরঞ্জন সেন। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সাবডিভিশনের উপসী গ্রামে, পিতার কর্মক্ষেত্রেই কেটেছিল সাবিত্রী রায়ের শৈশব। গ্রামীণ পরিবেশ আর পিসিমা অম্বিকাসুন্দরী দেবীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাব সাবিত্রী রায়ের মধ্যে পড়েছিল।

ঢাকার নিকটবর্তী উপসী গ্রামে মেয়েদের জন্য কোনো স্কুল ছিল না তাই বালকদের বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষারম্ভ। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে পড়তে আসেন কলকাতার বেথুন কলেজে। সেখান থেকে বি.এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.টি. পাশ করেন। এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হলে সাংসারিক প্রয়োজনে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। কলকাতাতেই পরিচয় হয় দাদা দেবপ্রসাদ সেনের একদা জেলসঙ্গী শান্তিময় রায়ের

সঙ্গে। আর সেখান থেকেই নির্মিত হয় ভালোবাসার সম্পর্ক, যার পরিণতি হিসাবে শান্তিময় রায়কেই জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেন।

সাহিত্যজীবনে কাব্যপ্রেরণা তিনি প্রথম পান 'স্ব হারাদের গান', 'চলার পথে' প্রভৃতি সে যুগের নিষিদ্ধ পুস্তক থেকে। স্বাদেশিকতা বিষয়ক কবিতা লিখেই সাবিত্রী রায় হাত পাকিয়েছিলেন। ''১৯৩১ সালে সাবিত্রীর বয়স যখন তেরো, তাঁর দাদা দেবপ্রসাদ সেনের জন্য এক প্রবল পুলিশি তল্লাশি চলেছিল তখন তাঁদের বাড়িতে, আর ফিরে পাওয়া যায়নি সেসব কবিতা।''[৩] 'চোখের জল ফেলো না মারিয়ানা' নামে তাঁর একটি অনুবাদ গল্প 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'সৈনিকের চিঠি' নামেও একটি ছোটোগল্প 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় ছিলেন শলোকভ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে সাবিত্রী রায়ের আসল ক্ষেত্র উপন্যাস।

সাবিত্রী রায়ের বিবাহের পাঁচ বছর পরে, ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে যশোহরে বসে লেখা হয় 'সৃজন' উপন্যাসটি। বামপন্থী আন্দোলনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্বে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। ১৯৫০-এ প্রকাশ পায় সাবিত্রী রায়ের 'ত্রিস্রোতা'। মেঘনা পদ্মার আশ্রিত পূর্ববঙ্গের কাহিনি শুরু ত্রিস্রোতা, শেষ কলকাতায়। গান্ধীবাদ, বিপ্লববাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি মতবাদ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ এই উপন্যাসের বিষয়ভিত্তি হয়েছে। আত্মজীবনের প্রভাব এই উপন্যাসে লক্ষ করা গেছে। কমিউনিস্ট পরিবারভুক্ত হয়েও সাবিত্রী রায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে অন্ধ আনুগত্য দেখাননি।

চলার পথে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো বিচ্যুতি লক্ষ করলে তার সমালোচনা করেছেন। শান্তিময় রায়ের সংস্পর্শে মার্কসীয় মতাদর্শে আকৃষ্ট হন ঠিকই, কিন্তু বিয়ের আগে থেকেই কমিউনিস্ট কাজকর্মে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ডক শ্রমিকদের ইউনিয়ানে ক্লাস নিতেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেত্রকোণায় কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন এবং সেখানে হাজং আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের কাছে জেনে নেন তাদের উপর অত্যাচারের কথা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০—এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের বিভিন্ন অসংলগ্নতা, অশোভনতা তিনি লক্ষ করেন এবং তারই প্রকাশ ঘটেছে 'স্বরলিপি' (১৯৫০) উপন্যাসে। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব উপন্যাসটিকে ভালোর চোখে দেখেননি। ''এই কারণে এ বই-এর প্রচার পার্টির মধ্যে বেশ কিছুদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়।''[৪] ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮—এই সময়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'পাকা ধানের গান'। বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ পর্বে এই উপন্যাসটির আরম্ভ আর গারো পাহাড়ের পাদপীঠে তেভাগা আন্দোলনের উত্তাল লগ্নে এর

সমাপ্তি। বিপ্লবী আন্দোলনের পথ ধরে সন্ত্রাসবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত এক কলেজ পড়ুয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত কৃষক সন্তান লেখাপড়া, আলোচনা মার্কসীয় সংস্পর্শে এসে কারামুক্তির পর কৃষক নেতায় পরিণত হয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনে চাষির ছেলেও শ্রমিক নেতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই কাহিনিসূত্রে তৎকালীন সময়পর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—'পাকা ধানের গান'-কে উপন্যাস না বলে এপিক বলা উচিত।"[৫] আমার আলোচনার পরিধি যেহেতু বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের উপন্যাস সে কারণে সাবিত্রী রায়ের 'সৃজন' উপন্যাসটির আলোচনাই এখানে থাকবে। রচনাগুণ ও অন্যান্য বিবর্তনরেখায় লেখিকার অবস্থান রূপান্তর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হল।

'সৃজন' সাবিত্রী রায়ের প্রথম উপন্যাস, প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসের কাহিনিতে বিশ্বজিৎ ও জয়ার জীবন কাহিনির উত্থান-পতনে উঠে এসেছে তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলন। এই উপন্যাসের কাহিনিতে রয়েছে—বিশ্বজিতের পূর্বতন জীবনের শৈশবের বর্ণনা। একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মাতৃহীন বিশ্বজিৎ আর তার দিদি শঙ্করী তার মাসিমা ও দাদুর কাছে বড় হচ্ছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বজিৎকে লক্ষ্মীপুরের জমিদার বাড়ি দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে। পূর্বতন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লক্ষ্মীপুরের জমিদার বাড়িতেই এখন বিশ্বজিৎ বসবাস করে। মালকিন বনলতার তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকে বিশ্বজিৎ। বিদ্যালয়ের পাঠশালায় ভর্তি হয়। ইতিহাস তার কাছে প্রিয় বিষয়। বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষকের ছেলে নিমুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। নিমুর মা-ও বিশ্বজিৎকে খুবই স্নেহ করেন। নিমুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় শান্তাদির সঙ্গে পরিচয় হয় বিশ্বজিতের। এই শান্তাদিই বিশ্বজিতের মনে গেঁথে দেয় সবহারাদের মুক্তির চিন্তা। পালিতা মা বনলতার অত্যধিক বাৎসল্য আর কড়া অনুশাসনের বন্ধন ছিন্ন করে বিশ্বজিৎ লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করে। বিশ্বজিৎ শান্তাদি সুব্রতদাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে বিপ্লবী আন্দোলনে। একদিন এক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং তার কারাবাসের শাস্তি হয়। কারাগারের অভ্যন্তরে বিশ্বজিৎ মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের সংস্পর্শে আসে। 'Ten days that shook the world', 'History of Russian Revolution', রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বজিৎকে আকর্ষণ করে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তার অসাধারণ শ্রদ্ধা। ''রুশ বিপ্লবের নির্দেশ তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সে বিপ্লবী লেনিনের জীবনী পড়িতে আরম্ভ করে।"[৬] বিশ্বজিতের মধ্যে আরও জিজ্ঞাসা দানা বাঁধে। বিশ্বজিৎ ক্রমশ কমিউনিস্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লক্ষ্মীপুরে মার কাছে কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেয়। সেখানে শুরু করে কমিউনিস্ট

কার্যকলাপ। বন্দরে শ্রমিক মহল্লায়, মার্কসীয় স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠন বাড়ানো ও নিজেকে সমৃদ্ধ করার কাজ করতে থাকে। একদা জেলসঙ্গী সুব্রতদার বোন জয়ার সঙ্গে বিশ্বজিতের বিয়ে হয়। বিয়ের পর জয়াকে লক্ষ্মীপুরে মায়ের কাছে রেখে কলকাতায় তার পার্টির কর্মসূচি পালনে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। শহরের শিক্ষিতা মেয়ে জয়া গ্রামের জমিদারির অন্দরমহলে আবদ্ধ থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠে। বিশ্বজিৎও নিরুপায়। দূর সম্পর্কের ভাই প্রশান্ত জয়াকে বন্ধুর সান্নিধ্য দিয়ে কিছু স্বস্তি দিলেও জয়া ওই সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলিত জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে। সন্তান প্রসবের কিছুদিন পর জয়ার মৃত্যু হয়। বিশ্বজিৎ তার কর্মের জগৎ ত্যাগ করে গ্রামে আসে। রাজনীতির সঙ্গে আপাত বিচ্ছিন্নতা ঘটে। পরে অবশ্য সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে।

'সৃজন' উপন্যাসের বিস্তৃত কাহিনিপটে সাবিত্রী রায় নিজের পারিবারিক জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। সুদক্ষিণা ঘোষ লিখেছেন—স্বামী ''শান্তিময় রায়ের জীবন ছবি তাঁর প্রথম উপন্যাসে এঁকেছেন সাবিত্রী।''[৭] 'সৃজন' উপন্যাসের নায়ক বিশ্বজিৎ যেমন লক্ষ্মীপুরের জমিদার বাড়ির দত্তকপুত্র তেমনই—''জমিদার বাড়ির সম্পত্তি রক্ষার তাগিদেই মা হারা শান্তিময়ও একদিন পিতামহের আশ্রয় ছেড়ে এসেছিলেন রায় বাড়িতে, প্রথমে গান্ধীবাদী আন্দোলনে দীক্ষা পরে যুগান্তর দলে যোগদান, আরও পরে জেলবাসের সময় মার্কসবাদের শিক্ষাকে অঙ্গীকার মন্ত্র—এসবই শান্তিময় রায়ের জীবনধারাকে অনুসরণ করেই এসেছে 'সৃজন'-এর নায়ক বিশ্বজিতের জীবনকাহিনিতে।''[৮] পাশাপাশি জয়ার কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে অনেকখানি মিলে গেছে সাবিত্রী রায়ের জীবনের প্রথম কয়েক বছরের রোজনামচা। উপন্যাস অংশে আমরা দেখি জয়া তার দাদা সুব্রতর জেলসঙ্গী বিশ্বজিৎকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে তেমনি সাবিত্রী রায়ও দাদা দেবপ্রসাদ সেনের জেলসঙ্গী শান্তিময় রায়কে বিয়ে করেছেন। সাবিত্রী রায়ের কন্যা গার্গী চক্রবর্তী লিখছেন—''ওঁর বিপ্লবী দাদার জেলসঙ্গী শান্তিময় রায়কে জীবনসঙ্গী নির্বাচিত করেন। ১৯৪০ সালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ওঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে বাবার জেল হয়। শুরু হয় জীবনসংগ্রামের ইতিহাস।''[৯]

উপন্যাস অংশেও আমরা উপরোক্ত ঘটনার ছায়া লক্ষ করি। অনাড়ম্বরভাবেই বিশ্বজিৎ জয়ার বিবাহ, বিবাহের পর বিশ্বজিৎ-এর আত্মগোপন করা, কারাবাস ইত্যাদি। অন্যদিকে লক্ষ্মীপুরে জয়ার একাকীত্বের যন্ত্রণা।

আমরা এখন আলোচনা করে দেখব, উপন্যাসে তৎকালীন বামপন্থী আন্দোলন কেমন দানা বেঁধেছে, মার্কসীয় চেতনার ছাপ কেমনভাবে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গটি আমরা শুরু করতে পারি উপন্যাসের মাঝ অংশ হতে। যেখানে দীর্ঘ

কারাবাসের পর বিশ্বজিৎ-এর কারামুক্তি ঘটেছে। সাবিত্রী রায় লিখছেন—''১৯৩৭ সাল পড়িয়াছে। বিশ্বজিতের দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ ছয় বৎসর পার হইয়া যায়। মনে হয় এই তো সেইদিনকার কথা''[১০] আগেই আমরা আলোচনা করেছি, লক্ষ্মীপুরের বাৎসল্য বেদনায় পীড়িত, শৃঙ্খলিত বিশ্বজিৎ সেখান থেকে চলে গিয়ে মুক্তি পেয়েছিল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদানের মধ্য দিয়ে। তারপরই কারাবাস। কারাগারের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে পরিচয়। অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ছয় বৎসর বাদ দিলে হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলন ভারতের মাটিতে বিকাশশীল অবস্থায়। মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কর্মী নেতারা ভারতের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। সেইখানে থেকেই সাবিত্রী রায় বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসের ধারাবাহিক অলোচনা শুরু করেছেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটির প্রতিষ্ঠা হয়। নেতৃত্বে আব্দুল হালিম। মুজফ্‌ফর আহমদ্, শামসুল হুদা, আব্দুল রেজা খানরা সহযোগী। অন্যদিকে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা এই সময় বৃদ্ধি পায়। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংঘের ঘটনা বাড়তে থাকে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেই মাস্টারদা সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত প্রমুখের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনা ঘটে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় ক্লাবে বোম মারতে গিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদেদার শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। বীণা দাসের গুলি চালনায় ১৯৩১-১৯৩৩-এর মধ্যে মেদিনীপুরের তিন জন জেলা মেজিস্ট্রেট-এর মৃত্যু হয়। ১৯৩২-এই বিনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান প্রভৃতি। এই কর্মতৎপর বাংলার অগ্নিগর্ভ সময়েই 'সৃজন' উপন্যাসের নায়ক বিশ্বজিৎ-এর রাজনীতিতে আসা। তারপর কারাবাস। কারা অভ্যন্তরেই পরিচয় বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে, মার্কসপন্থীদের সঙ্গে। ইংরেজ সরকারও বিপ্লবীদের উপর নামিয়ে আনে ব্যাপক দমনপীড়ন। ''ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গম—অঞ্চলে (যেমন বক্সা ক্যাম্প, দেউল ক্যাম্প, হিজলী ক্যাম্প, বহরমপুর ক্যাম্প) বন্দী শিবির বানিয়ে এবং আন্দামান সেলুলারসহ বিভিন্ন কারাগারে হাজার হাজার সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কারাগারেই তখন সশস্ত্র বিপ্লবীরা বানিয়ে নিয়েছেন মার্কসবাদী বিদ্যালয়। চোরা পথে আনা হচ্ছে কমিউনিজম-এর বইপত্র। তা নিয়ে চলছে নিবিড় পাঠ ও অনুশীলন। নতুন পথ—অনুসরণের প্রচেষ্টা।''[১১]

উপন্যাসের নায়ক বিশ্বজিতের মনেও প্রথম দিকে 'যুগান্তর'—'অনুশীলন' দলের প্রতি অনুরাগ ছিল। কারাবাস কালেও বিভিন্ন মতাদর্শের চর্চা সে চোখের সামনে দেখেছে। বিশ্বজিৎ-ও অনুসন্ধান করেছে—''কোথায় পথ? কী পথ? নিজেকে লইয়া এ ছিনিমিনি, এ

প্রবঞ্চনা আর নয়। এই অবসর শুধু অবসর নয়, ইহাই আত্মজিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট সময়।"[১২] বিশ্বজিৎ অনুসন্ধান করে চলে নতুন মতাদর্শ। ''রুশ বিপ্লবের নির্দেশ তাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।"[১৩] বিশ্বজিৎ পড়তে শুরু করেছে জন রীডের দুনিয়া কাপানো দশ দিন, ট্রটস্কির বই ইত্যাদি। বিশ্বজিৎ সঙ্গী হিসাবে পায় সুব্রত, রমেনকে। বিশ্বজিৎ পড়ে চলে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সেই চিরন্তনই লাইনগুলি—''The proletarians have nothing to lose but their chains. They a world to win. Working men of all Countries, unite."[১৪] কারান্তরালের অভ্যন্তরে বিশ্বজিৎদের পুরানো অগ্রজ যাঁরা জাতীয়তাবাদী বা উগ্রজাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বাহক তাঁরা একটু অসন্তুষ্টই হন। তবুও বিশ্বজিৎ সুব্রতরা তাঁদের বাধা নিষেধ কটাক্ষকে আমল দেয় না—''উহারা এখন খোলাখুলিভাবেই নিজেদের সাম্যবাদী বলিয়া প্রচার করে।"[১৫] বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীরা পরবর্তীকালে এভাবেই সংগঠনে এসেছেন। শান্তিময় রায়ও এভাবেই কমিউনিস্ট ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

এই উপন্যাসে বিশ্বজিৎ যেমন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতি থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে তেমনি এই উপন্যাসের অমলেন্দু বিবেকানন্দের অনুরাগী অবস্থান থেকে পার্টিতে এসেছে, এবং লিগপন্থী ইসমাইলও এইভাবেই মতাদর্শকে ভালোবেসে পার্টির অনুরাগী হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বিশ্বজিৎ-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এবং তারা কলকাতায় একটি ফ্লাটে থেকে সংগঠনের কাজকর্মে অংশ নিয়েছে। বিশ্বজিৎ খিদিরপুর অঞ্চলে ডকশ্রমিক ইউনিয়ানে ও শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে শ্রমিক সংগঠনের কাজ দেখার দায়িত্ব পায়।—''বিশ্বজিৎ মনে মনে খুশি হয়। এই তো সূচনা বিরাট ভবিষ্যতের আরম্ভ।"[১৬] রমেন ইসমাইলরা শ্রমিক মহল্লায় শ্রমিকদের মত করে বক্তৃতা করে পার্টির কর্মসূচির কথা জানায়। নাইট স্কুলে ডক শ্রমিকদের বিশ্বজিৎ রাশিয়ার বিপ্লবের ছবির বই দেখায় প্রচার করে বিপ্লবের। বিশ্বজিতের মনেও তখন এক বিপ্লবী উন্মাদনা—''নভেম্বর বিপ্লব... রক্তাক্ত রাজপথ... রাশিয়ান ছেলেমেয়েদের অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা! তারপর তাহাদের এই দলিত লাঞ্ছিত দেশেও বিজয়পতাকা উড়িয়ে—আকাশ চুম্বী লাল পতাকা পতপত করিয়া বাতাসে নড়িবে। আর তাহারই তলায় মুখর হইয়া উঠিবে বিজয় জনসমুদ্র, গর্বিত জয় উল্লাসে।"[১৭]

মৈত্রেয়ী মিত্র সাবিত্রী রায়ের 'সৃজন' উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন—''একটি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ধারাবাহিক ইতিহাস লেখক গল্পের মধ্য দিয়ে বলে গেছেন।"[১৮] ইতিহাসের একটি পর্বের পর আর একটি পর্বের দিকে লেখিকা নিয়ে গেছেন পাঠককে। ''১৯৩৯ সাল, ৩রা সেপ্টেম্বর। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে বিশ্বজিৎ ভোরের

কাগজ খোলে। নাৎসি সেনা ওয়ারসর দিকে। দুর্ধর্ষ কামানের গোলায় অগণিত শিশু নরনারীর বিচ্ছিন্ন আর্তনাদ খবরের কাগজের কালো অক্ষরে পংক্তিতে পংক্তিতে।"[১৯] এই বিশ্বযুদ্ধ পর্যায়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন ভারতে তার প্রভাবকে তুলে ধরেছেন, বিশ্বজিৎদের দিয়ে পালন করিয়েছেন পার্টি নির্ধারিত কর্মসূচি। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্বও অনেকখানি হতচকিত ছিল ভবিষৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে। পরবর্তীকালে এই বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত জড়িয়ে পড়লে পার্টি তার 'জন যুদ্ধ' নীতি (পূর্ববর্তী অধ্যায় এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে) ঘোষণা করে। সাবিত্রী রায়ও লিখেছেন—''তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তাহাদের বিপদের কতখানি সম্ভাবনা, সব কিছুই একটু একটু আলোচনা হয়। কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা, অজানা সম্ভাবনার রোমাঞ্চ। সব মিলিয়া কিসের যেন একটা ব্যথা কাঁটার মত খচখচ করিতে থাকে।"[২০] বিশ্বজিতের উপর দায়িত্ব বর্তায় দেশে গিয়ে সংগঠন গড়ার। গ্রাম অঞ্চলে গরিব প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে বিশ্বজিৎ মনোনিবেশ করে। বাড়িতে স্ত্রী জয়া। বিশ্বজিৎ পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গরিব কৃষকদের বোঝায় কিভাবে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষিত হচ্ছে। তার সঙ্গে সংগঠিত কর্মীবাহিনী নীরবে গোপনে বিভিন্ন স্থানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী পোস্টার মারছে। তাতে—''বড়ো বড়ো লাল কালো অক্ষরগুলি মস্ত গুদাম ঘরটায় টিনের বেড়ায় জ্বলজ্বল করিতে থাকে; এই যুদ্ধে এক ভাই এক পাইও নয়।"[২১] মনে রাখা দরকার এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ছিল। যুদ্ধের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' বেআইনি ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে বন্দী রাখা হয়। ৬৪৬৬ জনকে বিভিন্ন মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়... কাউকে শহর থেকে বহিষ্কার আবার কাউকে গৃহবন্দী, কাউকে থানাবন্দী করে রাখা হয়। তাই সেই সময় পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচি গোপনেই করতে হতো। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—''১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধার পর থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত আমাদের পার্টি সর্বশক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিল।"[২২] বিশ্বজিৎদের বাড়ির ছোটবড় সবাই যুক্ত হয়ে যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ওই বাড়ির ছোটছেলে কল্যাণ ব্রিটিশবিরোধী কাজে অংশ নেওয়ায় তার উপর রাজরোষ বর্ষিত হয়। জয়া তার মাথায় হাত দিয়ে বলে—''এবার তো মুখোমুখি পরিচয় সাম্রাজ্যবাদী দানবের সঙ্গে। দাদাদের উপযুক্ত ভাই হওয়া চাই কিন্তু।"[২৩]

বিশ্বজিৎদের ব্রিটিশ নজরদারি এড়িয়েই কৃষক খেতমজুরদের নামে পার্টির কাজ করে যেতে হয়। মাঝে মঝে শহর থেকে শান্তাদিরা এসে সহযোগিতা করে। বিশ্বজিতের চিন্তার জগতে ধরা পড়ে—''জগৎব্যাপী এক ধ্বংসলীলার সমারোহ। একের পর এক দেশ লুটাইয়া পড়িতেছে বিজয়ী গর্বিত নাৎসি সেনার পায়ে। নরওয়ে হইতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম গ্রিস যেন

ঘূণে ধরা কাঠের ঘর—ঝড়ের দাপটে ভাঙিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।"[২৪] এরপর বিশ্বজিৎ আবার কলকাতায় ফিরে আসে। জয়ার গর্ভে বিশ্বজিতের সন্তান। সে লক্ষ করে বিশ্বজিৎদের বাড়ির অবহেলা। অভিমান হয় বিশ্বজিতের উপর। গ্রামীণ সংস্কারে সন্তান প্রসব করলেও জয়া কঠিন ক্ষয়রোগ অর্থাৎ যক্ষায় আক্রান্ত হয়। সন্তানকে ছোঁবার মতো তার সাহস হয় না। বিশ্বজিৎ ফিরে আসে। জয়াকে চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যায় কিন্তু জয়া বাঁচে না। দীর্ঘদিন এই ক্ষেত্রে সময় যাওয়ায় রাজনীতির সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে বিশ্বজিতের। জয়ার অনুপস্থিতিও তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো কমিউনিস্ট সংগঠক শান্তিময় রায়ের সঙ্গেও পার্টির দূরত্ব তৈরি হলে তিনি পার্টি ত্যাগ করেন।[২৫]

মাতৃহীন সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব নিয়ে গ্রামেই থেকে যায় বিশ্বজিৎ। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুফল হিসাবে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গ্রামগুলিকে গ্রাস করেছিল। আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' ও সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাস আলোচনা পর্বে 'দুর্ভিক্ষ' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তৎকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছিল, এটা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। সরকারি নীতিও এই দুর্দশার জন্য কম দায়ি ছিল না। শহরে জাপানি বোমারু বিমান হানার ভয়ে অনেক মানুষ কলকাতা ছাড়ে। যদিও সেই সংখ্যাটা খুব বেশি ছিল না কিন্তু একটু খাবারের আশায় গ্রামের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল শহরে। 'একটু ফ্যান দাও মা'—এই চিৎকারে শহরের আকাশ বাতাস তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। বিশ্বজিতের চেতনায় ধরা পড়েছে তৎকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিকগুলি—''জাপানি বোমা...ইম্ফলে মণিপুর রোডে... আবার জনকোলাহলে মিলিয়া যায়, চলমান পথিকের কানাকানি। বিশ্বজিতের মস্তিষ্কের মধ্যে কিলবিল করিতে থাকে চিন্তার সরীসৃপগুলি। জাপানি বোমায় ভস্মীভূত ধানের গোলা—খেতখামার গরুবাছু ভরা গৃহস্থের বাথান, আরও কত কী!"[২৬] গ্রামীণ এলাকার মানুষের দুর্দশার ছবিও লেখিকা খুবই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আগেই লিখেছি, কালোবাজারি মুনাফাখোরদের কারণেই গ্রামীণ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা হারিয়েছিল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—''৪৩ সালে কৃত্রিম কারণে চালের দাম বাড়িয়ে মুনাফাখোরেরা দেড়শো কোটি টাকা বাড়তি লাভ করেছিল। কোনো সন্দেহ নাই যে সরকারী যোগসাজসেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল।"[২৭]

'সৃজন' উপন্যাসেও আমরা দেখি বিশ্বজিতের গ্রাম এলাকায় বিনয়বাবুরা হাটসভা উঠন বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে চাষির দুঃখের জন্য দায়ী কারা সে বিষয়ে প্রচার করেন। ধান ছাড়তে নিষেধ করে জাবেদ আলিদের বাড়িতে বসেছে সভা, বিনয়বাবু বক্তৃতা দিচ্ছেন—''ভাইসব আপনাদের সামনে ভয়ানক আকাল উপস্থিত। এই আকাল খোদার দেওয়া আকাল নয়। এই

শয়তানি ষড়যন্ত্র পিছন থেকে কল টিপছে। তাই এই আকাল। এই শয়তানের দল কারা জানেন? এই শয়তানের দল হচ্ছে—মজুতদারি চোরাকারবারি মহাজনরা।"[২৮]

সাবিত্রী রায় নীতিগতভাবে বামপন্থী। তাই শোষণ মুক্তির সংগ্রামের কথা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রায় উপন্যাসে আছে। তাঁর নিজস্ব চেতনা কোনো জাতীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বাস শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতায়। সে কারণেই তাঁর 'সৃজন' উপন্যাসের প্রতিটি সংগ্রামী কর্মীর চেতনায় সেই চিন্তাই প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক বিশ্বজিতের চেতনায় ধরা পড়েছে—'মস্কো হইতে প্যারী আর ইয়েনান হইতে ক্যলে ব্যাপী চলিয়াছে, কিন্তু গভীর মানবতাবোধ দিয়াছে তাহাকে অপূর্ব প্রাণশক্তি। তাই এই পিছু হটিয়াও রক্তবীজের মত জন্ম নেয়—সভ্যতার চির অমর শিশুরা সমুদ্রে, পাহাড়ে, শহরে, গ্রামে, প্রান্তরে প্রান্তরে। মানবতার অপূর্ব প্রাচুর্যে, জীবনের বিনিময়ে তাহারা সংগ্রাম করে শান্তি ও সভ্যতাকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া লইতে।"[২৯] এই বিশ্বাস যে নায়কের সে কখনও এই সংস্রব থেকে সরে থাকতে পারে না। সাবিত্রী রায়ও তাঁর উপন্যাসের প্রিয় নায়ক বিশ্বজিৎ ও তার প্রিয় মতাদর্শের বাহক প্রিয় রাজনীতিকে ছেড়ে থাকতে পারে নি। বিপন্ন চাষীরা সমবেত হয়েছে। মহাজনি কৌশলে তারা আজ সব হারিয়ে লড়াই-এর মুখোমুখি। তারা শুনতে পাচ্ছে—''দূরে সাত সমুদ্রের ওপারে রক্তাক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে... পৃথিবী ভরা একটি মাত্র রব —যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ।"[৩০] এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মহাজনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় অভিজ্ঞ চাষির দলের আহূত সভায় বিশ্বজিৎ না গিয়ে থাকতে পারে নি। তার উপস্থিতিতে সকলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ''আশার গুঞ্জন, বিশ্ববাবু আইচেন।" জমায়েত হওয়া বিপন্ন চাষীদের সংগঠিত মেজাজ দেখে বিশ্বজিৎ মনে মনে বলে উঠেছে—''বাঁচব, আবার আমরা বেঁচে উঠব। বাংলার চাষী মরতে পারে না। উদাও কণ্ঠে সে বলিতে আরম্ভ করে—ভাইসব...।"[৩১]

একালের একজন লেখিকা জয়া মিত্র সাবিত্রী রায়ের কথা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন—''মেয়েদের সামাজিক অবস্থান, তার জীবনের সঙ্গে তার সমাজের বিচিত্র ও বহুমাত্রিক সম্পর্ক, নারী পুরুষের মনোজগতের আকাঙ্ক্ষা সংযম-সপ্লেন্দ্রর জটিল আখ্যান, সমাজের বহিরঙ্গের ঘটনা—রাজনৈতিক পার্টি, সংগঠন—আন্দোলন আক্রমণ, অত্যাচার, হত্যা, আত্মহত্যা বাংলার সেই ঝোড়ো সময়ের বিস্তৃত ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করার সঙ্গেই রয়েছে লেখিকার অন্তরঙ্গ সমস্ত মণ্ডন শিল্প।"[৩২]

আগেই আমরা আলোচনা করেছি 'সৃজন' উপন্যাসটিতে সাবিত্রী রায় বামপন্থী আন্দোলনের দুটি দশকের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন। এই সূত্রে এসেছে নানান ঘটনা, ঘটেছে বহু চরিত্রের সমাবেশ। একটি বিষয় লক্ষণীয় সাবিত্রী রায় এই উপন্যাসে পুরুষদের

প্রাধান্য দিলেও নারীকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। বাম মতাদর্শ কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে নারীরা কমিউনিস্ট কার্যাবলীতে অংশ নেয় নি। 'সৃজন' উপন্যাসে নারীদের আমরা বিশেষ ভূমিকার লক্ষ করলাম। এই প্রসঙ্গে আমাদের চোখে প্রথমেই ভেসে ওঠে শান্তাদি চরিত্রটি। শান্তাদির সঙ্গে যখন বিশ্বজিতের আলাপ হয় তখন বিশ্বজিৎ স্কুল পড়ুয়া। সেই ছোটোকালেই বিশ্বজিতের চোখে দেশ প্রেমের স্বপ্ন এঁকে দেয় এই শান্তাদিই। পরবর্তীকালে বিশ্বজিতের রাজনৈতিক সহকর্মী হয়েছে শান্তাদি। শান্তাদির চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে সুন্দরভাবে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রী মহলে শান্তা যথেষ্টই জনপ্রিয়। তাকে ঘিরে মেয়েরা জড়ো হয়। একান্ত আড্ডায় সে সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেয়—''পলিটিক্স্ শুধু ছেলেদের একচেটিয়া নয়, মেয়েদেরও পূর্ণ অধিকার আছে রাজনীতিতে।''[৩৩] শান্তা এমনই সপ্রতিভ যে ছাত্রীরাও তাকে সমীহই করে—ভালোও বাসে। শান্তার মধ্যে রয়েছে এক বিপ্লবী সত্তা যে সত্তার জোরে সে মনে বল পায়। সাহসের সঙ্গে তাই সে ঘোষণা করতে পারে—''ভীরুর পত্নী হওয়ার চাইতে বীরের বিধবা হওয়া শ্রেয়।''[৩৪]

আমরা উপরিউক্ত আলোচনায় শান্তার নেতৃত্ব যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনা করলাম। শান্তা একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শকে ভালোবাসে। তুমুল তর্কে সে মতাদর্শের জোরে অনেককে পরাস্ত করতে পারে। উপরিউক্ত গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয় শান্তার সাংবাদিক সত্তা। 'ফুলকি' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে শান্তা। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাও সে। একজন নারী, নেতৃস্থানীয়া পত্রিকা সম্পাদক শিক্ষিকা এবং আপন মতাদর্শ প্রচারে তেজস্বিনী। এইভাবেই একজন সংগ্রামী নারীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন লেখিকা। পুরুষের সঙ্গে কোনো পার্থক্য রেখা নির্মাণ করেননি শান্তা চরিত্র নির্মাণে। ''প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের প্রথম উদ্দেশ্য হবে পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার অধিকার ভেদের ব্যবধান দূর করে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নারীর সমশ্রেণীয়তার ভাব নষ্ট করা।''[৩৫] এই বিষয়টি যেন সাবিত্রী রায়ের নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই অভিজাত অধ্যাপক, তৎকালীন বিধান পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভ্য পিতার একমাত্র কন্যা নমিতার, অজ্ঞাতকুলশীল বামপন্থী কর্মী অমলেন্দুকে জীবনসঙ্গী বেছে নিতে অসুবিধা হয় না। বামপন্থী মূল্যবোধই তাদেরই মিলনের পথ পরিষ্কার করেছে। শুধু শান্তাদি নমিতারা নয়, শুভাও শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে নাইট স্কুলে শ্রমিকবাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ার। আবার মার্কসীয় পাঠচক্রে অংশ নেয়।

তৎকালীন যুগের এক বামপন্থী তাত্ত্বিক মহিলা নেত্রী প্রতিমা দাশগুপ্ত লিখেছেন, মহিলাদের কাজের পন্থা হবে—''পণপ্রথা, পরদা প্রথা, অশিক্ষা, সামাজিক নিপীড়ন সর্বাঙ্গীন পরাধীনতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মেয়ে মহলকে জাগিয়ে তোলা। খেলাধূলা, বিতর্কসভা,

আলোচনা প্রগতিমূলক নাটক ইত্যাদির ভিতর দিয়ে মেয়েদের সচেতন করে তোলা।"[৩৬] সাবিত্রী রায়ের 'সৃজন' উপন্যাসের নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদের যুক্ত করেছে। এই উপন্যাসের নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারীরা জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে সংগঠনের কর্মীদের। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র জয়াও তাই করেছে। বিশ্বজিতের সঙ্গে বিয়ের পর গ্রামের বাড়িতে তার স্থায়ী ঠিকানা হয়। এক অজানা বন্ধন তাকে ঘিরে ধরে। অনুযোগ জানানোর জায়গা তার বিশ্বজিৎ, সেও পার্টি নির্দেশ পালন করতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। জয়ার কলেজ স্তরের বন্ধু বিশ্বজিতের দূর সম্পর্কের ভাই প্রশান্তর কাছে কবুল করেছে তার যন্ত্রণার কথা। তার কথাতেই উঠে এসেছে পরিশীলিত পুরুষতন্ত্রের প্রকাশ। সে প্রশান্তকে বলেছে— ''কমিউনিস্টদের বউদি কিনা, তাই ফিউডাল অটোক্র্যাসি সহ্য করতেই হবে। ঝাড় আর ফুঁকের চোটে অস্থির হয়ে উঠলাম। ফিউডাল যুগের ভূত ঝাড়ছি আমি ঘরে বসে আর তোমরা রাস্তায় রাস্তায় লাল ঝাণ্ডা হাতে ক্যাপিটাল যুগের ভূত ঝাড়ছ। একশো বছরের পার্থক্য ঘরে বাইরে।"[৩৭] এই অনুযোগ অমূলক নয়। তৎকালীন যুগের একজন কমিউনিস্ট বাইরের জগতের কর্মতৎপরতায় ব্যস্ত তখন সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয় না। ফিউডাল জমিদার গৃহিনী বনলতার অন্যায় আবদারের সঙ্গে জয়াকে মানিয়ে চলতে হয়। তবুও জয়ার মধ্যে যেন কমিউনিজমের ভাবনা মুছে যায় না। যক্ষায় আক্রান্ত জয়া মৃত্যুশয্যায় স্বপ্ন দেখে তার সন্তানকে নিয়ে—জয়ার মন ছুটে চলে বহু আগে। দীর্ঘ বছর পর গৌতম বড়ো হয়ে উঠবে, বলিষ্ঠ এক সুন্দর কিশোর। লাল পাতাকার তলায় সে বক্তৃতা দেবে তার কিশোর বন্ধুদের কাছে।" মনোজগতের মতাদর্শের জোরালো টান না থাকলে আপন সন্তানের ভবিষ্যতের সঙ্গে লালঝাণ্ডাকে টাঙিয়ে দেওয়া যায় না। সাবিত্রী রায় ভাবীকালের কছে এই স্বপ্নই রেখে গেছেন তাঁর 'সৃজন' উপন্যাসে।

উল্লেখপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৩২

২. তদেব, পৃ. ৩৩৩

৩. সামন্ত, সুমিতা (স.), 'সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস ব্যথা আর বুদ্ধির সম্মিলন', *সাবিত্রী রায় রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২ ব., পৃ. ৭

৪. মিত্র, মৈত্রেয়ী, 'কথাসাহিত্যিক সাবিত্রী রায়, একটি সমীক্ষা', *পরিচয়*, ৬০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, অমিতাভ দাশগুপ্ত (স.), কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৪৯

৫. ঘোষ, সুদক্ষিণা (স.), *সাবিত্রী রায় রচনা সমগ্র*, ২য় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি. কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৪৮৭
৬. সামন্ত, সুমিতা (স.), *সাবিত্রী রায় রচনা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৪১২ ব., পৃ. ৫৭
৭. তদেব, পৃ. ৭
৮. তদেব
৯. চক্রবর্তী, গার্গী, 'ব্যক্তিমানুষ সাবিত্রী রায়', *সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫
১০. রচনা সমগ্র, পৃ. ৬৫
১১. দাশ, সুস্নাত, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী ধারা*, যুবশক্তি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৬৯
১২. রচনা সমগ্র, পৃ. ৫৭
১৩. তদেব
১৪. তদেব, পৃ. ৫৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫৯
১৬. তদেব, পৃ. ৭৪
১৭. তদেব, পৃ. ৭৬
১৮. কথা সাহিত্যিক সাবিত্রী রায় : একটি সমীক্ষা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
১৯. রচনা সমগ্র, পৃ. ১০০
২০. তদেব
২১. তদেব, পৃ. ১২৬
২২. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, *তরী হতে তীর*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৩১৪
২৩. রচনা সমগ্র, পৃ. ১৩৩
২৪. তদেব, পৃ. ১৩৩
২৫. সাবিত্রী রায় রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, সাবিত্রী রায় পরিচিতি অংশ
২৬. রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫
২৭. *তরী হতে তীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১
২৮. রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮
২৯. তদেব, পৃ. ১৬১
৩০. তদেব, পৃ. ১৬২
৩১. তদেব, পৃ. ১৬৩
৩২. মিত্র, জয়া, 'সাবিত্রী রায়, ঝড়ের দিনের কথাকার', *বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার*, ঊষা মাজি মুখোপাধ্যায় (স.), দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ২৯
৩৩. রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫
৩৪. তদেব, পৃ. ৮৬

৩৫. সেন, রুবি, 'নারী আন্দোলনের গোড়ার কথা', *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ (স.), আনন্দ, ২০১১, পৃ. ৪২৪

৩৬. দাশগুপ্ত, প্রতিমা, 'ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রী সম্প্রদায়', *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ (স.), আনন্দ, ২০১১, পৃ. ৪২৪